পিশাচ কাহিনী

ভ্যাম্পায়ার

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত



পিশাচ কাহিনি

ভ্যাম্পায়ার

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

উৎসর্গ

শামীম পারভেজ

হরর গল্প ভক্ত এই লেখকের গল্প

আমার সম্পাদিত গ্রন্থে প্রকাশের অপেক্ষায় আছি।

সূচি

ভূমিকা

ধূসর আতঙ্ক'র মুখবন্ধে লিখেছিলাম 'ভ্যাম্পায়ার' নামে একটি পিশাচ কাহিনি সংকলন শীঘ্রি উপহার দেব পাঠকদেরকে। সংকলনের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। অনুবাদ, অ্যাডাপটেশন এবং মৌলিক গল্প মিলিয়ে মোটামুটি ১২/১৩ ফর্মার একটা বই প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছিলাম। ভাবছিলাম এরপর ক্ষান্ত দেব এ পরিশ্রমসাধ্য কাজ থেকে। আমার পরিকল্পনার কথা জেনে আঁতকে উঠলেন লেখক বন্ধু শামীম পারভেজ। ইনি রংপুর থাকেন। সেবা'র বইয়ের মহা ভক্ত। হরর গল্প পেলে আর কিছু চান না। জানতে চাইলেন কেন আর হরর গল্প সংকলন করতে চাইছি না। বললাম আমার কাছে রহস্যপত্রিকার যে স্টক ছিল, সেখান থেকে সেরা গল্পগুলো বাছাই করে ফেলেছি। খুব ভাল গল্প আর পাব বলে মনে হয় না। তাই ভ্যাম্পায়রই সম্ভবত আমার সম্পাদিত শেষ বই হতে যাচ্ছে। শামীম পারভেজ আবারও হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন, তাঁর কাছে ১৯৮৪ সাল থেকে প্রকাশিত এ পর্যন্ত সমস্ত রহস্যপত্রিকা আছে। আমার জন্য তিনি হরর এবং পিশাচ কাহিনির একটা তালিকা পাঠিয়ে দিতে চান। তাঁর উৎসাহ লক্ষ করে আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললাম, 'ঠিক আছে। দেন পাঠিয়ে। তবে যে গল্পগুলো আপনার ভাল লেগেছে এবং আমার সম্পাদিত বইতে যায়নি, শুধু সেসব গল্প পাঠাবেন।' মোবাইল রাখার আগে বন্ধুটি জানালেন দিন পনেরো পরে আবার আমার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করবেন।

ঠিক দু'হপ্তা পরে ফোন করলেন শামীম পারভেজ। উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন, 'দাদা, দারুণ কিছু হরর গল্প পেয়ে গেছি গত ২২ বছরের রহস্যপত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে। আপনি নাম আর সংখ্যাগুলো লিখে নিন।'

আমি ঢাউস তালিকাটা লিখে নিলাম। শামীম পারভেজের উল্লেখিত রহস্যপত্রিকার বেশ কিছু আমার কাছে ছিল না। কাজেই যেতে হলো

সেবায়। মহিউদ্দিন ভাইকে বলতে তিনি ফাইল ঘেঁটে সংখ্যাগুলো বের করে দিতে রাজি হলেন। (ফাইল ঘাঁটাঘাঁটির কাজটা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই করেন)। আমি তখন দৈনিক যুগান্তর-এ সিনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে কাজ করছি। প্রচুর কাজের চাপ। মধ্য রাতে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত শরীরে বাসায় ফেরার পরে আর টেবিলে বসতে ইচ্ছে করে না। রহস্যপত্রিকার এতগুলো গল্প কীভাবে পড়ব? আমাকে এ ধরনের বিপদে সবসময় যিনি রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করেন, এবারও সেই টিংকু ভাই এগিয়ে এলেন। বললেন গল্পগুলো পড়ে মতামত দেবেন তিনি। তাঁর উপর আমার ভরসা শতভাগ। তিনি গল্পগুলো পড়লেন, ভাল-মন্দ সার্টিফিকেট দিলেন। ভাল গল্পগুলো পড়লাম। মুগ্ধ হলাম। সবগুলোই মৌলিক রচনা। দেশী পটভূমিকায় লেখা। তখন সিদ্ধান্ত নিলাম এবারের সংকলনে অনুবাদের দিকে যাব না। মৌলিক পিশাচ কাহিনিই এবারের সংকলনে প্রাধান্য পাবে। কয়েকটি অ্যাডাপ্ট গল্পও ছিল, দেশী পটভূমিকা অবলম্বন করে লেখা। বেশ চমৎকার। যোগ হলো এগুলোও। তারপর দাঁড়িয়ে গেল চমৎকার একটি পিশাচ কাহিনি সংকলন।

এ সংকলন সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে চাই না। কারণ আমার সম্পাদিত আগের বইগুলো যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন মানের প্রশ্নে আমি কখনও আপোষ করি না। আর প্রবীণদের চেয়ে নবীনদের প্রতি আগ্রহ একটু বেশি। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি নবীনরা সত্যি দারুণ লেখেন।

ভ্যাম্পায়ার-এ খাঁটি পিশাচ কাহিনিই স্থান পেয়েছে। এমন সব গল্প আছে এতে, পড়ার সময় খাড়া হয়ে যাবে গায়ের রোম।

আমার লেখক বন্ধুটি যে তালিকা পাঠিয়েছেন, সে তালিকায় আরও বেশ কিছু হরর গল্প রয়ে গেছে। টিংকু ভাই আরেকটি হরর গল্প সংকলন করতে উৎসাহী। তিনি ইতিমধ্যে বেশ কিছু গল্প পড়েও ফেলেছেন। জানিয়েছেন তাঁর পড়া গল্প দিয়ে আরেকটি হরর গল্প সংকলন তৈরি করা সম্ভব। তিনি আগামী বইমেলায় বইটি পাঠকদেরকে উপহার দিতে চাইছেন। তাঁর উৎসাহ দেখে ভালোই লাগছে আমার। কাজেই...

অনীশ দাস অপু
২৬৩, জাফরাবাদ (৪র্থ তলা)
শঙ্কর, ঢাকা।

ভ্যাম্পায়ার

এক

চিঠিটা পেয়ে প্রথমে অবাক হয়ে গেলাম আশফাকের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বছর কয়েক তো হবেই। শুনেছি কুসুমপুরে বাবার বিশাল ফার্ম দেখাশোনা করছে ও। মস্ত এলাকা জুড়ে আধুনিক চাষাবাদের পাশাপাশি রয়েছে ডেয়ারি ও পোলট্রি ফার্ম। ঢাকায় বলতে গেলে আসেই না। চিঠিটা পড়ে দোটানায় পড়ে গেলাম কলেজ জীবনের বন্ধু ও। অনেকবার বলেছে ওদের দেশের বাড়ি বেড়াতে যেতে। সঙ্গে করে নিয়েও যেতে চেয়েছে, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি নানা কারণে। চিঠিতে আবার একই অনুরোধ করেছে ও।

বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে বসে আছি। হাতে অফুরন্ত সময়। ঠিক করে ফেললাম যাব এবার।

বালিডাঙা জংশনে পৌঁছুলাম সন্ধে সাতটায়। স্টেশনে নামতেই এগিয়ে এল বেঁটে মত এক লোক। 'আপনে কি শহীদ সাব?' হ্যাঁ বলাতে সে জানাল আশফাক তাকে পাঠিয়েছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ওর নাম সদরুদ্দি। আশফাকদের দারোয়ান।

আশফাকদের বাড়ি এখান থেকে মাইল চারেক। রাস্তা ভাল না। হেঁটে যেতে হবে। সরু পায়ে চলা পথ। অন্ধকার। একটানা ডেকে চলেছে ঝিঁঝি। পাতা কাঁপার আওয়াজ কানে আসছে। এই সন্ধে বেলাতেই মনে হচ্ছে গভীর রাত। দু'একজনকে চোখে পড়ল, বাড়ি ফিরছে। এরকম জায়গায় আশফাকরা থাকে কী করে? অবশ্য মানুষ অভ্যাসের দাস। আস্তে আস্তে সব কিছুতেই সে অভ্যস্ত হয়ে যায়। সদরুদ্দি সাথে না থাকলে কী বিপদেই না পড়তাম।

যখন পৌঁছলাম তখন রাত পৌনে আটটা। আশফাক বাইরেই ছিল। আমাকে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল, 'দোস্ত, কেমন আছিস? শেষ পর্যন্ত কথা রাখলি আমার। আয় ভেতরে আয়।'

দুই

পরদিন আলাপ হলো আশফাকদের ম্যানেজার হাকিম সাহেবের সঙ্গে। পরলোকী ব্যাপার-স্যাপারে ভদ্রলোকের খুব আগ্রহ। প্রচুর পড়াশোনা করেছেন এ নিয়ে। মৃত্যুর পর আত্মার কর্মকাণ্ড কোন্ ধারায় চলে সে সব কথা শোনালেন আমাকে। ভদ্রলোক অত্যন্ত ধর্মপ্রাণও বটে মুখে কাঁচা পাকা মস্ত দাড়ি। নামাজ রোযা করেন নিয়মিত।

এখানকার একমাত্র ডাক্তার কুদ্দুস সাহেবও প্রতিদিন সন্ধ্যায় আড্ডা দিতে আসেন আশফাকদের বাড়িতে। আর কোনওখান থেকে কল এলেই ছুট লাগান সেদিকে। ভদ্রলোক বেজায় ভীতু। হাকিম সাহেবের পরলোক চর্চা মোটেও ভাল লাগে না তাঁর।

আর একজন যাঁকে দেখলাম তিনি হচ্ছেন সুলতা জোসেফ। ভদ্রমহিলা বিধবা। খুব বেশি দিন হয়নি এসেছেন এখানে। আগে রাজশাহীতে ছিলেন। আশফাক তাঁকে খালা বলে ডাকে। তাঁর একমাত্র ছেলে আমেরিকায় পড়াশোনা করছে। মায়ের খোঁজখবর নেয় না বড় একটা। আশফাককে ছেলের মত স্নেহ করেন তিনি। আশফাকের মা নেই। বাবাও নানা কাজে বেশির ভাগ সময়ই ব্যস্ত থাকেন। ফলে সুলতা খালার কাছেই যত আবদার ওর।

একদিন সন্ধ্যায় গল্প করছিলাম আমি আর হাকিম সাহেব। কথা হচ্ছিল পৃথিবীতে সত্যিই ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব আছে কিনা সে নিয়ে। হাকিম সাহেবের ধারণা পিশাচ সব যুগেই ছিল, এখনও আছে।

'পিশাচের ব্যাখ্যা কী?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

হাকিম সাহেব বললেন, 'অশরীরীদের দেহ নেই এটা তো জানো। কিন্তু দেহ না থাকলেও অতৃপ্ত আত্মারা অনেক সময় মৃত মানুষের শরীরে আশ্রয় নেয়। তারপর সেই মৃতদেহ জ্যান্ত হয়ে ওঠে। মানুষের রক্ত শুষে বেঁচে থাকে। এরাই পিশাচ।' খুব দৃঢ়তার সাথে কথাগুলো বললেন তিনি। কাঁটা দিল আমার গায়ে।

'অনেকে তো রক্তাল্পতার কারণে মারা যায়। আপনার কি ধারণা পিশাচরাই তাদের মৃত্যুর কারণ?'

ঠিক এসময়েই ঘরে ঢুকলেন সুলতা খালা। হাকিম সাহেবের জবাব আমার আর শোনা হলো না।

'পিশাচ-টিশাচ কী যেন সব শুনছিলাম? কীসের গল্প হচ্ছে?' একটা চেয়ার টেনে জাঁকিয়ে বসলেন তিনি।

'হাকিম সাহেব আমাকে জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন।' হাসতে হাসতে বললাম আমি।

'নিশ্চয়ই ভূতের গল্প! এ ধরনের গল্প শুনতে খুব ভাল লাগে আমার। বলুন না, হাকিম সাহেব একটা ভয়ঙ্কর ভুতুড়ে গল্প।'

'ভূতের গল্প বলছিলাম না আমি। রক্তচোষা ভ্যাম্পায়্যরের আলাপ করছিলাম।'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন সুলতা খালা। 'আচ্ছা, হাকিম সাহেব, আপনি কি এইসব ভূত-প্রেত, পিশাচে সত্যিই বিশ্বাস করেন?'

'না করে উপায় কী বলুন? আমাদের এই কুসুমপুরেই রক্তচোষার উপদ্রব শুরু হয়েছে বলে আমার ধারণা।'

চমকে উঠলাম আমি। বলেন কী ভদ্রলোক! 'আপনার এমন ধারণার কোনও কারণ আছে?' জানতে চাইলেন সুলতা খালা।

'নিশ্চয়ই। সম্প্রতি এই এলাকার বেশ ক'জন লোক রক্তাল্পতার কারণে মারা গেছে। আমার বিশ্বাস চুষে নেয়া হয়েছে তাদের রক্ত।'

হেসে ফেললেন সুলতা খালা। বললেন, 'এক কাজ করুন। বন্দি করে ফেলুন একটা ভ্যাম্পায়ারকে। দেখে জীবন সার্থক করি।'

'দরকার হলে তাই করতে হবে।' গম্ভীর মুখে বললেন হাকিম সাহেব।

তিন

পরদিন যথারীতি আমাদের আড্ডা বসেছে সন্ধে বেলায়। কিছুক্ষণ পরেই উঠে পড়লেন কুদ্দুস সাহেব। রোগী দেখতে যেতে হবে জানা গেল রোগী হচ্ছে সুলতা খালার বাসার কাজের ছেলে

মকবুল। সে রক্তাল্পতা অর্থাৎ অ্যানিমিয়া রোগে ভুগছে। ‘কুসুমপুরে এই রোগের খুব বাড়াবাড়ি লক্ষ করছি। ব্যাপারটা কী?’ জানতে চাইলেন হাকিম সাহেব।

‘আমিও অবাক হয়ে গেছি। বুঝতে পারছি না কিছুই।’ বললেন কুদ্দুস সাহেব।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন হাকিম সাহেব। ‘ডাক্তার সাহেব. চলুন আমরাও আপনার সাথে যাব।’

সুলতা খালার বাসায় পৌঁছতে চার-পাঁচ মিনিট লাগল। বাসার এক পাশে কাজের লোকদের ঘর।

আমরা সবাই গেলাম সেখানে। একটা চৌকিতে শুয়ে আছে মকবুল। মুখটা ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য। চোখে-মুখে তীব্র আতঙ্কের ছাপ। একনজরেই বুঝলাম, ওর চোখে-মুখে মৃত্যুভয়। দেখে মনে হচ্ছে যেন বেঁচে নেই ও। ম্লানমুখে তার পাশে বসে রয়েছে কেরামত। এ বাড়ির মালি।

কুদ্দুস সাহেব পরীক্ষা করে নিচু গলায় আমাদের বললেন, ‘বাঁচার চান্স নেই প্রায়। আজকেও হয়ে যেতে পারে।’

একটা ময়লা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে রয়েছে মকবুল। কাঁধ পর্যন্ত ঢাকা। হাকিম সাহেব তার পাশে গিয়ে বসলেন। চাদরটা সরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কী যেন দেখলেন। মকবুলের গলার কাছটায় আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ডাক্তার সাহেব, এটা কীসের দাগ?’

‘ক্ষতচিহ্ন বলেই তো মনে হচ্ছে। পোকা-মাকড়ের কামড়ের দাগ হয়তো। যা নোংরা ঘর।’ চিহ্নটা পরীক্ষা করে বললেন কুদ্দুস সাহেব।

‘মকবুলের দেখাশোনা করছে কে?’ জিজ্ঞেস করলেন হাকিম সাহেব।

'বেগম সাব। তানি মকবুলরে নিজের পোলার লাহান ভালাবাসে। রাইত জাইগা পোলাডারে দেখ্‌শুন্‌ করে।' গদগদ হয়ে বলল কেরামত।

'রোগীর ভালমত সেবা-যত্ন হওয়া দরকার,' হঠাৎ বলে বসলেন হাকিম সাহেব। 'আমি ওকে আমার বাসায় নিয়ে যেতে চাই। আমার ধারণা তা হলে বেঁচে যাবে ও।'

হাকিম সাহেবের এমন ধারণার কারণ কী আমি ভেবে পেলাম না। রোগীর দরকার চিকিৎসা। যে কোনও জায়গায় সেটা ঠিকভাবে হলেই তো হলো। তা ছাড়া সুলতা খালা সেবা-যত্ন কম কিছু করছে না। কিন্তু হাকিম সাহেবের ওই একই কথা, 'ওকে আমার বাসায় নিয়ে যাব।'

সুলতা খালার সাথে দেখা করে হাকিম সাহেব মকবুলকে নিয়ে যাবার কথা বলতে গেলেন। আমাদেরকেও সাথে যেতে হলো।

সব কথা শুনে অনেকক্ষণ খালা কিছুই বললেন না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে। বোঝা গেল না বিরক্ত হয়েছেন কিনা। তবে আপত্তি করলেন না তিনি। বললেন, 'আপনার বাসায় যদি মকবুলের সুচিকিৎসা হয় তাতে কোনও আপত্তি নেই আমার। আমি ওর ভাল চাই। ও সুস্থ হয়ে উঠলে আমার চেয়ে বেশি খুশি হবে না আর কেউ।'

মকবুলকে নিয়ে চলে এলাম আমরা।

চার

মুষলধারে বৃষ্টি নামল রাতে। সেই সঙ্গে ঝড়। শেষ রাতে হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুম। একটানা শব্দ হচ্ছে: ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্। যেন কেউ জানালায় টোকা দিচ্ছে। এত রাতে আবার কে জ্বালাতে এল। ভাবলাম, আমারই শোনার ভুল। কী শুনতে কী শুনেছি। জানালার কাঁচে বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে। তারই শব্দ বোধহয়। সশব্দে বাজ পড়ল কাছে কোথাও।

কিন্তু ওই তো, আবার শুরু হয়েছে শব্দটা। এবার আর ভুল শুনিনি। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম বিছানায়। সত্যিই কেউ জানালায় টোকা দিচ্ছে। কিন্তু ঘরে ঢুকতে চাইলে দরজার কড়া নাড়লেই হয়। জানালায় টোকা কেন?

অচেনা জায়গা বলে সঙ্গে করে ঢাকা থেকে টর্চ নিয়ে এসেছি। ওটা রয়েছে বালিশের পাশেই। টর্চটা তুলে নিয়ে জানালা লক্ষ্য করে সুইচ টিপলাম। টর্চের তীব্র আলোতে দেখলাম, জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কে যেন। দুই হাত আর মুখ জানালার সাথে লাগিয়ে রেখেছে। যেন ভেতরটা দেখতে চায়। মাথায় এলোমেলো লম্বা কালো চুল। আলো পড়তেই দেখতে পেলাম তার চোখ জোড়া। জ্বলছে ধক্ ধক্ করে। ক্রুদ্ধ।

ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এল হাত-পা। বেশ কিছুটা বেঁকে গেছে জানালার দুটো শিক। ভাঙার চেষ্টা করছিল! মূর্তিটাকে দেখতে পেলাম না আর। আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুঁক দিলাম। ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। বুক ফেটে বেরিয়ে আসবে যেন।

যতগুলো দোয়া-দরুদ জানি খাটে বসে সবগুলো পড়তে শুরু করলাম। অনেকখানি সাহস ফিরে পেলাম এবার। উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিয়ে এলাম জানালাটা।

শুয়ে পড়লাম আবার। চোখে ঘুম নেই। মিনিট পনেরো পর আবার– ঠক্ ঠক্। এবার উল্টো দিক থেকে আসছে। ও দিকের জানালাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছি। টর্চের আলোতে আবার চোখে পড়ল ভয়ানক সেই মূর্তি। জানালা ভেঙে ভেতরে ঢোকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। জোরে জোরে সুরা পড়তে শুরু করলাম। একে একে সবগুলো। এমনি সময় হঠাৎ কানে এল মোরগের ডাক। থেমে গেল শব্দটা। মূর্তিটাকে দেখতে পেলাম না আর।

দুঃস্বপ্ন দেখলাম? প্রশ্ন করলাম নিজেকে। নাকি সত্য এসব?

আর ঘুমোতে পারলাম না। জেগে বসে রইলাম বাকি রাতটুকু। আর দোয়া-দরুদ পড়লাম। চোখে একটু ঢুলুনি এলে চমকে যাই। শুধু মনে হয়, যে কোনও সময় হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়বে বুঝি ওই মূর্তিটা।'

পাঁচ

সকালের রোদ যখন জানালা দিয়ে ভেতরে এসে পড়েছে তখনও আমি বিছানায় বসে ঢুলছি। এমন সময় কানে এল বাইরে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। বেরিয়ে এসে দেখি হাকিম সাহেব। গত রাতের সেই দুঃস্বপ্নের পর কাউকে দেখতে পেয়ে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম। হাকিম সাহেব ভেতরে এসে বিছানায় বসলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এত ভোরে যে! মকবুলের খবর কী?'

'ও তো প্রায় সেরেই গেছে,' মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন হাকিম সাহেব।

'বলেন কী? এক রাতের সেবাতেই সেরে গেল?'

'মকবুলের তো কোনও অসুখ হয়নি, ও আসলে পড়েছিল ভ্যাম্পায়ারের কবলে।'

হেসে ফেললাম আমি। বললাম, 'আপনি ভূত-প্রেত ছাড়া আর কিছু বুঝি ভাবতে পারেন না?'

'জানি তুমি ঠাট্টা করবে। কিন্তু আমি যদি কাল সারারাত মকবুলের শিয়রে বসে না থাকতাম তবে আজ আর তাকে বেঁচে থাকতে হত না। ওর ধারে কাছে কেউ আসার সুযোগ পায়নি গতরাতে। কালও যদি তার রক্ত শুষে নেয়া হত...'

কেড়ে নিলাম তাঁর মুখের কথা, 'মানে? কে মকবুলের রক্ত শুষে নেবে? আপনি এসব কী বলছেন?'

হাকিম সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তবে শোনো। কাল রাতে আমি কী দেখেছি সেটা বলি। বললে হয়তো তুমি বিশ্বাস করবে।'

চুপ করে রইলাম আমি। তারমানে, গতরাতে তিনিও কী স্বপ্নে আমার মতোই ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছেন? কিছু বললাম না আমি। ঠিক করলাম আগে পুরোটা শুনব।

হাকিম সাহেব বলতে শুরু করলেন, 'আমি যে ঘরটায় ভাড়া থাকি সেটা একটা বাড়ির দেড়তলা, জানোই তো। গতরাতে বাইরে যখন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি চলছে তখন আমি বসে আছি মকবুলের বিছানার পাশে। মাঝ রাতে ঝড়-বৃষ্টি বেড়ে গিয়েছিল, টের পেয়েছ নিশ্চয়ই। সেই সময় ঠক্‌ঠক্‌ আওয়াজ হলো জানালায়। বিজলীর ঝলকানিতে স্পষ্ট দেখলাম জানালার বাইরে

দাঁড়িয়ে আছে একটা নারী মূর্তি। প্রায় পনেরো ফুট উঁচু আমার ঘরটা। সেটার জানালায় কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে মই ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। অবাক হয়ে গেলাম। চিনতেও পারলাম কে সে। তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারছ?'

কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। ঘাড় নেড়ে বললাম, 'না তো!'

'আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল সে। দু'চোখে তার তীব্র ঘৃণা আর ক্রোধ। ভেতরে ঢুকতে চায়। মকবুলের রক্ত দরকার তার। বুঝতে পেরে হাতের কাছে পড়ে থাকা পিতলের গ্লাসটা ছুঁড়ে মারলাম তাকে লক্ষ্য করে। ওটা সজোরে আঘাত করল তার কপালে। কিছুক্ষণের জন্যে মিলিয়ে গেল মূর্তিটা। সেই সুযোগে ভাল করে বন্ধ করে দিলাম জানালাটা। একটু পরে শুনি কে যেন আবার টোকা দিচ্ছে। বেশ জোরে জোরে। বুঝতে পারলাম সহজে ছাড়ছে না সে মকবুলকে। কোরান শরীফের আয়াত পড়ছি আর ফুঁ দিচ্ছি ঘুমন্ত মকবুলের বুকে। এভাবে কাটল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর আবার আওয়াজ শুরু হলো অন্য দিকের জানালায়। আওয়াজ ক্রমেই বাড়ছে। জানালাগুলো ভাঙার চেষ্টা করছে সে।

'পুরনো কাঠের জানালা। হাত দিয়ে ঠেলে ধরে রাখতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। অদৃশ্য কী যেন প্রবল চাপ দিচ্ছে জানালায়। জোর ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম মেঝেতে। কিছু একটা ঢুকে পড়ল ভেতরে, বুঝতে পারলাম। ছুটে এসে উঠে পড়লাম খাটে। দেখলাম ঘরের কোণে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ধীরে ধীরে জমাট বাঁধছে। এগিয়ে আসছে ওটা মকবুলের দিকে।

'আগেই পানি পড়া ছিটিয়ে রেখেছি খাটের চারপাশে। ফলে বৃত্তের ভেতর ঢুকতে পারছে না ওটা। খাটের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছায়ামূর্তিটা। এক আধবার বৃত্তের ভেতর পা পড়লেই

ছিটকে সরে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে। কিন্তু বুঝলাম এভাবে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ভয়ে ঢিব্ ঢিব্ করছে বুকের ভেতরটা। মরিয়া হয়ে চোখ বুজে পড়তে শুরু করলাম দোয়া-দরুদ। একমনে। অনুভব করলাম পাগল হয়ে গেছে ওটা। রক্ত চাই। জমাট বাঁধা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। কিন্তু সুবিধা করতে না পেরে হার মানল শেষ পর্যন্ত। ক্রুদ্ধ গর্জন করে টেবিলের ওপরকার কাঁচের গ্লাসটা সজোরে চূর্ণ করল সে। তারপর বেরিয়ে গেল জানালা দিয়ে। বুঝলাম বিপদ কেটে গেল। হালকা বোধ করলাম।'

এ পর্যন্ত বলে থামলেন তিনি। 'খুব অদ্ভুত লাগছে আমার কথাগুলো তাই না?' কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলেন।

জবাব দিতে পারলাম না আমি। বুঝলাম ওখানে ব্যর্থ হয়েই আমার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল ওই অশরীরী প্রেতাত্মা। কিন্তু কপাল ভাল আমার। ভোর হয়ে এসেছিল তখন।

আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম হাকিম সাহেবকে। সব শুনে উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'চিনতে পেরেছ ওকে?'

'কাকে?'

'ওই ভ্যাম্পায়ারকে?'

'না তো। আমাদের চেনা কেউ?'

'অতি পরিচিতি— মিসেস সুলতা জোসেফ।'

'বলেন কী! চেহারায় অবশ্য কিছুটা মিল...'

'টেলিগ্রামে খবর আনিয়েছি আমি। মিসেস সুলতা জোসেফ আজ থেকে পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন। রাজশাহীতে। অ্যানিমিয়া রোগে।' গম্ভীর মুখে বললেন হাকিম সাহেব। 'খুব সম্ভব আর কোনও ভ্যাম্পায়ারের কবলে পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর।'

আমার সারা শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেল কথাটা শুনে।

আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন হাকিম সাহেব, হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। সুলতা খালা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার বাইরে। ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন হাকিম সাহেবকে দেখে।

সবার আগে আমার দৃষ্টি চলে গেল তাঁর কপালের দিকে। যা দেখলাম তাতে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। বেশ অনেকখানি ফুলে আছে ওঁর কপালটা।

ছয়

হাকিম সাহেবকে আমার ঘরে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সুলতা খালা। তাঁর চোখে-মুখে যে দৃষ্টি দেখলাম তা কোনও মানুষের চোখে কোনওদিন দেখিনি।

তারপরেই হঠাৎ খ্যাপার মত দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়েই বারান্দা পেরিয়ে সোজা রাস্তায় নেমে পড়লেন তিনি। ছুটতে লাগলেন দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে।

সেদিন বিকেলে খবর পেলাম ট্রেনে কাটা পড়েছেন তিনি। দৌড়াতে দৌড়াতে সোজা চলে গিয়েছিলেন রেল লাইনে। তারপর ঝাঁপ দিয়েছেন ট্রেনের তলায়।

আশফাককে গত রাতের কথা কিছুই বলিনি। সুলতা খালার মৃত্যুতে খুব ভেঙে পড়েছে বেচারা। হাকিম সাহেব আমাকে শুধু সান্ত্বনা দিলেন, 'দুঃখ কোরো না, যে দেহ ট্রেনের তলায় কাটা পড়েছে সেটা কোনও মানুষের দেহ নয়। ওটা হচ্ছে পিশাচ-আশ্রিত দেহ।'

সাত

সুলতা জোসেফকে কবর দেয়া হলো কুসুমপুর খ্রিস্টান গোরস্থানে। এরপর কেটে গেছে দিন পনেরো। সবাই অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ভাবছি এবার ঢাকা ফিরে যাব। কিন্তু মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন খোঁচা দিচ্ছে বার বার। কুসুমপুরে রক্তাল্পতা রোগের প্রভাব এখনও কমল না কেন?

এরই মধ্যে একদিন ঢাকায় ফেরার টিকিট কেটে ফিরে আসছি। সেই অন্ধকার সরু রাস্তাটা দিয়ে। একাই। একটু আগেই সন্ধ্যা নেমেছে। রাস্তাটা পেরিয়ে একটু মোড় ঘুরতেই নজরে পড়ল একটু দূরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দিকে তাকিয়ে। আমাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু আমি যা দেখার দেখে নিয়েছি। ভয়ে বুক হিম হয়ে গেছে আমার। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ।

দাঁড়িয়ে আছে একটা নারীমূর্তি। চিনে ফেলেছি আমি। সুলতা খালা। পরনে সেই শাড়ি যেটা পরে পনেরো দিন আগে ট্রেনে কাটা পড়েছেন। আস্তে আস্তে হাঁটছেন তিনি। ভুল বললাম, ভাসছেন। মাটিতে পা নেই তাঁর। মেঘের মত যেন শূন্য দিয়ে ভেসে চলেছেন। ক্রমশ মিলিয়ে গেল সেই ভয়ানক মূর্তিটা।

ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এলাম। হাঁপাচ্ছি। বৈঠকখানায় বসে আছেন হাকিম সাহেব। আর কেউ নেই। সুলতা খালার মৃত্যুর পর আমাদের আড্ডা আর বসে না। আজও আসেনি কেউ।

প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বললাম হাকিম সাহেবকে, 'সুলতা খালা।

আমি সুলতা খালাকে দেখেছি!'

সোজা হয়ে বসলেন তিনি। 'বলো কী?'

'স্টেশন থেকে ফিরছিলাম। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। আমি দেখেছি।'

'ঠিক দেখেছ তো?'

'তবে আর কী বলছি।'

উঠে দাঁড়ালেন হাকিম সাহেব। 'চলো। দেরি করা চলবে না। কোনও কথা জিজ্ঞেস কোরো না এখন।'

নিজের বাড়ি থেকে কোদাল, হাতুড়ি আর একটা কাঠের খুঁটি জোগাড় করলেন তিনি। চোখা দেখে। কোদালটা ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে।

আবার ফিরে চললাম সেই রাস্তায় যেখানে শেষবার দেখা দিয়েছিলেন সুলতা জোসেফ। ইতোমধ্যে আঁধার ঘন হয়ে এসেছে। জোনাকী জ্বলছে এখানে সেখানে। বড় বড় গাছের ছায়া পড়েছে। কোথায় যেন একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। বুক ঢিপ ঢিপ করছে আমার। হাকিম সাহেব কিন্তু ভয় পাচ্ছেন বলে মনে হলো না। চোখে পড়ল কবরস্থান। রাস্তাটা থেকে বেশি দূরে নয়। সারি সারি কবর দেখা যাচ্ছে। আশপাশে ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গল।

আমাকে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেলেন হাকিম সাহেব। বললেন, 'চুপ করে বসে থাকো। একদম আওয়াজ কোরো না।'

সারারাত সেখানে বসে রইলাম দু'জনে। পাথরের মূর্তির মত। এই রাতটা আমার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ রাত। মিনিটগুলো যেন একেকটা দিনের মত লম্বা, পীড়াদায়ক। কবরস্থানে বসে থেকে নিজেদের মনে হলো পরলোকের বাসিন্দা।

চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। পুব দিক লাল হয়ে উঠতে লাগল

ধীরে ধীরে। ভোর আসছে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হঠাৎ আমার গা টিপলেন হাকিম সাহেব। দেখতে পেলাম উল্টোদিকের আবছা অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন সুলতা জোসেফ। ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন গোরস্থানে। গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন একটা ভাঙা পুরানো কবরের উপর। তারপর আস্তে আস্তে নেমে গেলেন কবরের ভেতর। চারদিক শান্ত, চুপচাপ।

আট

তখন সূর্য উঠি উঠি করছে। হাকিম সাহেব আমাকে ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'আর দেরি করা উচিত নয়। জলদি এসো।'

তিনি আমাকে সুলতা জোসেফের কবরের পাশে নিয়ে এলেন। বললেন, 'কোপাতে শুরু করো।'

তাঁর এই খেয়াল হলো কেন জিজ্ঞেস করার মানসিকতা তখন নেই আমার। আমি সম্মোহিতের মত তাঁর নির্দেশ পালন করলাম।

বেশ কিছুক্ষণ কোপানোর পর দেখতে পেলাম একটা কফিনের একাংশ। পুরোটা যখন স্পষ্ট হলো তখন হাকিম সাহেব বললেন, 'আমি কফিনটা খুলছি। তারপর যা করব তুমি শুধু দেখে যাবে। বাধা দেবে না। শুধু মনে রেখো, কফিনের ভেতরের দেহটা কোনও মৃত মানুষের নয়।'

হাকিম সাহেব খুলে ফেললেন কফিনের ডালা। ভেতরে শুয়ে রয়েছে সুলতা খালার দেহ। আস্ত। দেখে বোঝা যায় না এ দেহ কোনওদিন ট্রেনে কাটা পড়েছিল। মৃতদেহের মুখটা একেবারে

তরতাজা, সতেজ। কেবল ঠোঁটের দু'পাশ থেকে বেরিয়ে আছে লম্বা দুটো দাঁত। তীক্ষ্ণ। তাতে লেগে রয়েছে রক্তের দাগ। পনেরো দিন আগে এ লাশ কবর দেয়া হয়েছে, বিশ্বাসই হয় না।

কাঠের একটা খুঁটি, পরে জেনেছি ওটাকে বলে কিলক, বসালেন হাকিম সাহেব– মৃতদেহের বুকে। তারপর গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে তার ওপর বসিয়ে দিলেন হাতুড়ির বাড়ি। কয়েক বাড়িতেই আমূল ঢুকে গেল ওটা। একনাগাড়ে বিড় বিড় করে চলেছেন হাকিম সাহেব। কোরানের আয়াত পড়ছেন।

বাঁশির তীক্ষ্ণ, দীর্ঘ আওয়াজ যেন চিরে দিল চারপাশের নিস্তব্ধতাকে। তারপর মাংস খসে পড়তে শুরু করল মৃতদেহের শরীর থেকে। আমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে কঙ্কালে পরিণত হলেন সুলতা জোসেফ।

কাজী শাহনূর হোসেন

গোরস্তানের বিভীষিকা

এক

দীর্ঘ ত্রিশ বছর হুজুরের খেদমতে থাকবার পর অবশেষে জয়নাল খাঁ-র মসজ়িদের ইমামতির দায়িত্বটা এসে পড়ল আমার উপর। আমার পীর সাহেব হুজুরের বয়স তখন অনেক, নব্বইয়ের উপর। জরাগ্রস্ত শরীর। চলতে ফিরতে অসুবিধে। তাই মসজিদের ইমামতির গুরুদায়িত্ব ধরে রাখাটা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। সময়ক্ষণ ধরে রুটিন মাফিক কাজ। অনেকটাই অক্ষম বৃদ্ধ একজন মানুষের পক্ষে যেটা একেবারেই সম্ভব না।

এতদিন ধরে হুজুরের হাওলাতেই ছিলাম। পীরে কামেল হজরত মওলায়ানা বশারতুল্লা আল হিলালী সাহেব। আমার পীর কেবলা। বারো বছর বয়সে যাঁর পবিত্র সোহ্‌বতে বাপজান আমাকে সঁপে দিয়েছিলেন। সেই থেকে আজ অবধি আমি এইখানেই আছি। আধ মাইল দূরে হুজুরের গড়া একটা দাখিলী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি।

জয়নাল খাঁ-র মসজিদ খুবই পুরানো। সোয়া দুশো বছরের মত এর বয়স। ভিতরের দেয়ালের জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা

খসে পড়েছে। আর বাইরের চুন সুরকির দেয়ালে লেগেছে নোনা। ছাদের কোনায় কোনায় সবুজ শ্যাওলার পুরু আস্তরণ ভেদ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বট পাকুড়ের ছোট ছোট চারা। শোনা যায় মাঝে নাকি ষাট-সত্তর বছর আগে একবার এটির মেরামতও করা হয়েছিল। তবুও বয়সের ভারে নুব্জ এখন মসজিদটি।

সংলগ্ন কিছু এলাকা বাদে মসজিদটির চারপাশে পনেরো-বিশ বিঘার মত বিশাল এলাকা নিয়ে বাঁশ বাগান। মাঝে মধ্যে আম কাঁঠালের গাছ। জারুল, হিজল, কড়াই, ছাতিম, বকুল ও অন্যান্য জঙলা গাছ এ বিশাল বাগানের কোন কোন জায়গায় এতটাই ঘন হয়ে জড়িয়ে পাকিয়ে আছে যে দিনের বেলায় সূর্যের আলো পর্যন্তও সেখানের মাটিতে পড়ে না। আঁধার গ্রাস করে থাকে গোটা জায়গায়। ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে দিনের বেলায়ও গা ছম ছম করে। তার উপরে রয়েছে মসজিদের পাশেই শ'দেড়েক বছরের তেমনি পুরানো গোরস্তানটি। শুরু হওয়ার সময় থেকেই নাকি আশপাশের আট দশটা গ্রাম থেকে বয়ে নিয়ে আসা মরা মুর্দাদের এই গোরস্তানেই দাফন করা হচ্ছে। মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা একশো বিশ বছর আগে মারা যাওয়া জয়নাল খাঁ-র কবরটাও এই গোরস্তানেরই দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে বাঁধানো অবস্থায় আছে।

যখনকার কথা বলছি শুক্রবারের জুম্মাসহ দৈনিক পাঞ্জেগানা নামাজ যথারীতি পড়ানো তো হতই, তা ছাড়াও পড়ানো হত রমজান মাসের সারা মাস তারাবীর নামাজ। মহররম, শবেবরাত, শবেমেরাজ ইত্যাদি ইসলামী পর্বগুলোতে মসজিদে নেওয়া হত বিশেষ নফল এবাদত বন্দেগীর ব্যবস্থা। এসব কিছু ছাড়াও রমজান মাসের আরও একটা বিশেষ নফল এবাদত

চলত মসজিদে। সেটি হলো এহ্তেকাফ। আর দায়িত্বপ্রাপ্ত ইমাম সাহেরের উপরই ওই এহ্তেকাফ করবার দায়িত্বটা ন্যস্ত ছিল। আমি আমার হুজুরকে তাঁর ইমামতির দায়িত্বে থাকবার সময়টাতে নিয়মিত এটা করতে দেখেছি। এবং ওঁনার কাছ থেকেই শুনেছি মসজিদটা চালু হওয়ার পর থেকেই যে সকল ইমাম সাহেব এই মসজিদের ইমামতির গুরু-দায়িত্ব পেয়েছিলেন তাঁরা সবাই নাকি প্রায় প্রতিটা রমজান মাসের শেষ দশদিন এই এহ্তেকাফ করতেন মসজিদের ভিতরে বসে।

এখানে বলে রাখি এই এহ্তেকাফ করাটা খুবই মর্তবাপূর্ণ এবং অপরিসীম সওয়াবের কাজ। এটা নিভৃতে একাকী বা সঙ্গীসহ মসজিদের ভিতরে বসে করতে হয়। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা শুধুমাত্র ইস্তেন্জাহ (পায়খানা প্রস্রাব ইত্যাদি প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম) এবং প্রয়োজনে বিশ্রামার্থে সামান্য ঘুম ব্যতিত সারা সময়টাই দুনিয়ার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মকোলাহল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে মনপ্রাণ ঢেলে একমাত্র আল্লাহকেই ডেকে যেতে হয়। তাঁর আরাধনাতেই মগ্ন থাকতে হয়। এটাই মূলত এহ্তেকাফ। শোনা যায় এই এহ্তেকাফকারীকে ধোঁকা দেওয়া বা ভয় দেখানোর জন্য শয়তান নানা ভাবে ওত পেতে থাকে। কখনও ভূতপ্রেত বা কখনও জিন-পরীর ছদ্মবেশ ধরে এসে শয়তান এহ্তেকাফকারীকে নানারূপ ভয়ভীতি বা ধ্যান ভঙ্গ করানোর চেষ্টা করতে থাকে। বিশেষ করে রাতের মধ্য বা শেষ প্রহরেই শয়তানের এই আনাগোনাটা বেশি চলে। তাই দারুণ সাহস আর নৈতিকবল রাখতে হয় এহ্তেকাফকারীকে। অনেক এহ্তেকাফকারী এহ্তেকাফ করতে গিয়ে নিশুতি রাতে একা মসজিদে ভয় পেয়ে পরে মারাও পড়েছে এমন নজিরও আছে। আমার হুজুরের মুখ থেকেই এ রকম কাহিনী আমি

অনেক শুনেছি। এবং সেজন্যই মসজিদের ইমামতি পাওয়ার পর রমজান মাসের এই এহ্‌তেকাফ করবার নিয়মাবলীর সাথে সম্ভাব্য শয়তানী ভয়ভীতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করণীয় কাজ এবং দেহবন্ধ রাখবার জন্য দোয়া কালামও কিছু শিখিয়ে দিয়েছিলেন আমার হুজুর কেবলা।

তো এখন আসল কাহিনীতে আসি। এহ্‌তেকাফ করতে গিয়ে ওই মসজিদে গভীর রাতে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম আমি। আমার ইমামতির সময়টাতে তো বটেই– এমনকী আমার সারা জীবনেই বোধহয় ওই একটিমাত্র ঘটনাই উল্লেখ করবার মত। যা কোন দিনও আমার স্মৃতির পাতা থেকে মুছে যাবে না।

এখন থেকে প্রায় আশি বছর আগে। হিজরী তেরোশো পঁয়তাল্লিশ। পুরো চৈত্র মাস জুড়ে পড়েছে পবিত্র রমজান। গরমের দাবদাহে চতুর্দিক পুড়ে ছারখার। ২০ রমজান থেকে ৩০ রমজান পর্যন্ত দশ দিন এহ্‌তেকাফ করবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অন্য কোন উপযুক্ত সঙ্গী না পেয়ে আমাকে একাই এহ্‌তেকাফ করতে হচ্ছে মসজিদে বসে। সারাদিন প্রচণ্ড গরম, বাইরে আগুনের হলকা ছুটলেও চারদিক ঘন বনবনানীতে আবদ্ধ থাকবার জন্য মসজিদের ভিতরে গরমের আঁচ খুব একটা অনুভূত হয় না। বেশ সহনীয় একটা পরিবেশই বজায় থাকে। দিনের বেলা জোহর এবং আসরের নামাজে উপস্থিতি কম থাকলেও ইফতারীর পর মাগরেবের নামাজের সময় মুসল্লীদের উপস্থিতি অনেকটা বেড়ে যায়। তারপর রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে আবার তারা আসে তারাবী পড়তে। তারাবী পড়ার সময়টুকু পর্যন্ত আশপাশ লোকালয় থেকে অনেকটাই জন বিচ্ছিন্ন এই মসজিদটা একটু সরব থাকে। কিন্তু তারপর

থেকেই নামে নীরবতা। অখণ্ড সে নীরবতা। আর সেই নীরবতার সাথে জুড়ে থাকা কৃষ্ণ পক্ষের ঘন কালো অন্ধকার চারপাশের পরিবেশটাকে যেন ভৌতিক করে তোলে। মসজিদের কেরোসিনের সলতেঅলা টিমটিমে ছোট্ট চেরাগটা বিশাল এলাকার ঘন অন্ধকারের মধ্যে জোনাকীর আলোর মত জ্বলতে থাকে। ভূত-প্রেতের প্রতি ঘোর অবিশ্বাসী, বাস্তববাদী, দৃঢ়চেতা কোন মানুষও অমন নিভৃত একাকী পরিবেশে রীতিমত ভয়ে অস্থির হয়ে যাবে।

যদিও একাকী তবুও বেশ সাহসের সাথেই এহ্তেকাফ করে যাচ্ছিলাম। চৈত্র মাসের গুমোট গরমে রোজাদার হিসাবে দিনের বেলায় সামান্য কষ্ট দিলেও রাতের নিঃসীম নীরব ওই পরিবেশটা যেন আমাকে বেশ ভালই একটা আমেজ দিচ্ছিল। সে আমেজটা একাকী হওয়ার। চারপাশের সবকিছু থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটা অপার্থিব আমেজ। মাত্র কয়েকদিনের এহ্তেকাফেই বেশ বুঝতে পারছিলাম আমি যেন আস্তে আস্তে আমার সেই আরব্ধ পরম পাওয়া সৃষ্টিকর্তার একান্ত সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে যাচ্ছি। নিজেকে যেন সঁপে দিতে পারছি পুরোপুরি তাঁর হাতে।

তিনদিন পেরিয়ে এহ্তেকাফ তখন চতুর্থ দিনে গড়িয়েছে। আর দিন শেষের ওই রাতটা তেইশে রমজানের রাত। তারাবীর নামাজ শেষে মুসল্লীরা যে যার বাড়িঘরে ফিরে গেছে। আধখোয়া চাঁদ পুব আকাশে উঠবে তবে তা আরও খানিক পরে। চারদিক নীরব। থমথমে। এই নিথর নিস্তব্ধ বিশাল এলাকায় আমিই একমাত্র প্রাণী যে এই শূন্য মসজিদটার ভেতর ঠায় বসে আছি।

একটু একটু করে রাত বেড়ে চলেছে। সাথে সাথে নিস্তব্ধ

পরিবেশটাও যেন আরও নিস্তব্ধ হয়ে আসছে। একটা ঝিঁঝি পোকার ডাক পর্যন্ত নেই আশপাশের কোথাও। পবিত্র কোরানের একটা দীর্ঘ সূরা পাঠ করে শেষ করেছি কিছুক্ষণ আগে। কয়েক রাকাত নফল নামাজ পড়ব। পড়ে আবার সূরা ইয়াসিন ধরব। তারপর সামান্য ঘুম দিয়ে উঠে তাহাজ্জদের নামাজ পড়ব। এইটাই নিয়ত করেছি। পুবের খোলা দরজা দিয়ে দেখি চাঁদটা একটু একটু করে বেশ খানিক উপরে উঠে গেছে। সামান্য আবছা আবছা আলোও ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

আর তখনই গন্ধটা এসে লাগল নাকে। লোবানের কটু গন্ধ। আর সেই সাথে বাতাসের সামান্য এক ঝটকায় আমার সামনে রাখা মাটির চেরাগটাও নিভে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আশপাশে তাকাতে লাগলাম। বাইরে সামান্য জোছনার আলো থাকলেও মসজিদের ভিতরটা গাঢ় অন্ধকারে ভরপুর। কিছুই মালুম হচ্ছে না। ব্যাপারটার কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে বসে থাকলাম চুপচাপ। দোয়া কালাম পড়তে থাকলাম। কিন্তু ওই লোবানের গন্ধ যেন আরও ঘন হয়ে নাকে এসে লাগতে লাগল। মনে হলো মসজিদের বাইরের কোন জায়গা থেকে কটু লোবানের গন্ধটা আসছে। শরীরের ভিতর ভয়ের একটা শিহরণ অনুভব করলাম মুহূর্তে। সাথে সাথে উঠে গিয়ে প্রথমেই পুবের খোলা দরজাটা এক ঝটকায় বন্ধ করে দিলাম। ভিতরের গাঢ় অন্ধকার তখন আরও বেশি গাঢ় হলো।

গুটিসুটি মেরে বসে আল্লার নাম জপছি। আর তখন বাইরে থেকে ভেসে এল দুপ্ দুপ্ ধুপ ধুপ শব্দ। মনে হলো যেন কারা মসজিদের বাইরে ওই গোরস্তানটার দিকে কোদাল দিয়ে মাটি

খুঁড়ছে। মাটি কোপানোর শব্দ স্পষ্ট আমার কানে এসে লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। একটা ঠাণ্ডা রক্তস্রোত যেন মুহূর্তে মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত নেমে গেল আমার।

কিছুক্ষণ ধরে শব্দটা চলল। তারপর এক সময় সাহস করে উঠে এসে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মসজিদের দক্ষিণ পাশের গোরস্তান সোজা জানালাটা খুলে দিলাম। কিন্তু খুলেই যা নজরে পড়ল তাতে আমার চক্ষু একদম স্থির। রক্ত হিম করা ভয়ের সাথে এবারে জাগল বিস্ময়। একী! খাটিয়ায় শায়িত সাদা ধপধপে কাফনে মোড়ানো একটা লাশ গোরস্তানটার পশ্চিম পাশে পড়ে আছে। ওটার সিথানে রাখা অনেকগুলো জ্বলন্ত লোবান কাঠি। সেগুলো থেকে কুণ্ডুলী পাকানো ধোঁয়া উপরে উঠে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

আর তার পাশেই ক'জন লোক কোদাল দিয়ে খুঁড়ে চলেছে কবর। খুবই দ্রুত এবং ক্ষিপ্রতার সাথে মাটি খুঁড়তে থাকবার জন্যই ওদের কোদালের কোপ থেকে অমন দুপ্ দুপ্ ধুপ্ ধুপ্ শব্দ হচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রালোকে মোটামুটি স্পষ্টভাবে রহস্যময় ওই ভৌতিক দৃশ্যটা দেখলাম আমি।

চিৎকার দিতে যেয়েও যেন পারলাম না। গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না। ধপাস করে ওই জানালা সোজা মসজিদের মেঝেতে বসে পড়লাম। দোয়া ইউনুস পড়তে থাকলাম ঘন ঘন। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। বুকের ধুকপুকানি সহ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও বেড়ে গেল। এ ভাবে কতক্ষণ কেটে গেলে একসময় কিছুটা স্বাভাবিক হলাম বটে, তবে আমার ভিতরের আতংক গেল না। ভূত পিশাচের অনেকরকম বিবরণ বা ওদের কায়কারবার লোকমুখে শুনেছি ইতিপূর্বে, তবে

তা যে এরকম পিলে কাঁপানো ভয়ংকররূপে দেখা দেবে তা ছিল আমার ধারণারও বাইরে। বিষয়টা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। সাথে সাথে কৌতূহলও বেড়ে গেল। কী হতে পারে এমন একটা রহস্যময় ভৌতিক দৃশ্যের মানে? দৃশ্যটা কি বাস্তব? অর্থাৎ খাটিয়ায় শোয়ানো কাফনে আবৃত ওই লাশটা কি আসলেই কোন মরা মানুষের রক্তমাংসের দেহ? আর ওই কবর কাটায় রত লোকগুলোও কি বাস্তব জগতের রক্তমাংসধারী মানুষ? নাকি ইথারে ভাসমান রহস্যময় কোন ভৌতিক ছবি, যেটা শূন্যে সরাসরি দৃশ্যমান হয়ে এখন আমার চোখে ধরা পড়ছে। কিন্তু ওইটা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করে দেখবার কোন ক্ষমতা আমার এই মুহূর্তে আদৌ নেই। কে যাবে মসজিদের সদর দরজা খুলে ওই দৃশ্যের বাস্তবতা পরীক্ষা করতে?

তাই একদিকে বিস্ময়ে হতবাক, অন্যদিকে আতংকে মুহ্যমান হয়ে মসজিদের ভিতরেই বসে থাকলাম। কোরান তেলাওয়াৎ সহ এহ্‌তেকাফের অন্যান্য করণীয় কাজগুলো বাধাগ্রস্ত হলো। কোনভাবেই মন বসাতে পারছি না ওদিকে।

এদিকে ওই লোবানের গন্ধটাও কিন্তু পুরোপুরি নাকে এসে লাগছে তখনও। আবার উঠে গিয়ে কি জানালার কাছটাতে দাঁড়াব? দেখব এখন ওখানটাতে কী হচ্ছে? কিন্তু মনে প্রবল ইচ্ছা থাকলেও ভয় আর আতংকে সেঁধিয়ে থাকা ইচ্ছাশক্তিটা সায় দিচ্ছে না, তাতে বাধা দিচ্ছে উঠতে। কী জানি আবার কী দেখতে পাব গোরস্তানটার ওদিকটায়। যদি আরও ভয়ঙ্কর কোন দৃশ্য দেখতে হয়!

আর ঠিক এরই মধ্যে যেন লোকজনের কোলাহলের আওয়াজ কানে এল। অনেক লোক জড়ো হয়ে কথা

বলছে। কিন্তু তাদের বলা কথাগুলো অনেকটাই অস্পষ্ট আর ক্ষীণ হয়ে কানে এসে বাজছে। মনে হচ্ছে যেন বহুদূর থেকে ওই কথাগুলো ভেসে আসছে। আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। যদিও ভয়ে বুকের ভিতরের ধুকপুকানি তখনও থামেনি, তবুও সাহস নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এবং ওই জানালায় যেয়ে উঁকি দিলাম। এবারে যা দেখলাম তাতে কিন্তু আমি আরও আশ্চর্য, আরও অভিভূত হয়ে গেলাম। সত্যি সত্যিই অনেক লোকের সমাগমে সারা গোরস্তান এলাকাটা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। লোকগুলো কথা কাটাকাটি করছে। লাশটা ঠিক আগের জায়গাতেই সদ্য খোঁড়া গোরটার পাশে পড়ে আছে। ওটার শিয়রে রাখা লোবান কাঠিগুলো থেকে তেমনি ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হচ্ছে।

মনে হলো মরা ওই মুর্দাটাকে কবর দেওয়া নিয়েই ওদের পরস্পরের ভিতর কোন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আর তার জন্যই এই কথা কাটাকাটি। কিন্তু ওদের বলা কথাগুলো এত নিচু লয়ের যে, ঠিক ভালভাবে শুনতে পাচ্ছি না। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা শব্দের মতই তা কানে এসে লাগছে। তাই কী বলছে ওরা তা ঠাহর করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

পাগড়ি পরিহিত মুরুব্বী কিসিমের কজন মুসল্লীর মধ্যে কী নিয়ে যেন একটা বাদানুবাদ শুরু হতেই গোর দিতে আসা লোকগুলোও সাথে সাথে দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। আর তখনই ওদের ভিতরকার দ্বন্দ্বটাও প্রকট আকার ধারণ করল। কথা কাটাকাটি ক্রমে হাতাহাতিতে রূপ নেওয়ার উপক্রম হলো। আর তখনই দেখলাম উপস্থিত সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটল ওই গোরস্তানে। লোকজনকে

অবাক করে দিয়ে উপর থেকে উজ্জ্বল সোনালী আভাযুক্ত বিরাট দুটি হাত নীচে নেমে এল। এবং মুহূর্ত দেরি না করে ওই হাত দুটি খাটিয়ায় শোয়ানো ওই লাশটার দুই পাশে জাপটে ধরে সঙ্গে সঙ্গেই উপরের দিকে উঠে যেতে থাকল। এবং চোখের পলকেই তা যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুসল্লীরাসহ গোর দিতে আসা লোকজন এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে ভয়ে আর আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়ল। অনেকে ভয়ে রীতিমত কাঁপতে লাগল। তারপর আর কারও দিকে কেউ তাকাবারও ফুরসৎ পেল না। যে যার মত দৌড়ে প্যালাতে শুরু করল। গোরস্তান এলাকাটা ফাঁকা হয়ে গেল নিমেষে।

অলৌকিক ওই দৃশ্যটা দেখে কী পরিমাণ যে ভয় পেয়েছিলাম জানি না। তবে আমার মাথায় এমন এক চক্কর দিল যে আমি জানালা সোজা মসজিদের ভিতর পড়ে গেলাম। গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে পড়তে লাগল। প্রথমে আয়াতুল কুরসী, পরে সূরা ইয়াসিন পড়ে বুকে বার কয়েক ফুঁ দিলাম। তারপর উঠে আমার জায়গায় গিয়ে বসে পড়লাম। আর এইমাত্র দেখা রহস্যময় ভয়াবহ ওই দৃশ্যটার কথা কল্পনা করতে থাকলাম বার বার। লক্ষ করলাম লোবানের ওই কটু গন্ধটাও যেন উধাও হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ চিন্তা করবার পর মনে হলো, ব্যাপারটা হ্যালুসিনেশান নয় তো? হ্যালুসিনেশানে আক্রান্ত হলে অনেকে এরকম অভাবনীয় রহস্যময় দৃশ্য খেলে যেতে দেখে। যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। কিন্তু না, সেটা হবে কী করে? পরক্ষণেই বাতিল করে দিলাম ওই যুক্তিটা। এই পবিত্র রমজান মাসে রোজাদার একজন মানুষ রোজা

থেকে কোনভাবেই মতিভ্রম হয়ে হ্যালুসিনেশানগ্রস্ত হতে পারে না।

তবে কি অলৌকিক ওই দৃশ্যটার সাথে লৌকিক জগতের ঘটে যাওয়া কোন বাস্তব দৃশ্যের সাদৃশ্য রয়েছে? যেটা ঘটে ছিল ঠিক এই গোরস্তানেই কোন সময়। এখন এতদিন পরে এসে এই রাতনিশিথে যেটা আমার চোখে দৃশ্যমান হলো?

শেষোক্ত এই সম্ভাবনাটাই যেন আমাকে বার বার আলোড়িত করতে থাকল। হ্যাঁ, হতে পারে এমন কোন ঘটনা যেটা সুদূর অতীতে এই গোরস্তানেই হয়তো ঘটেছিল। কালের বিবর্তনে ইথারে ভেসে থাকা ওই দৃশ্যের ফটোপ্রিন্ট দৈবক্রমে আমার বাস্তব চর্মচক্ষুতে ধরা পড়েছে।

বিষয়টা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ঘুম যখন ভাঙল জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখি কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণকায় ওই চাঁদটা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সেহ্‌রী সমাগত। আমার সে রাতের তাহাজ্জুদের নামাজটা মাঠে মারা গেল। উঠে তাড়াতাড়ি করে সেহ্‌রী খেয়ে নিয়ে ওজু করে ফজরের নামাজের প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। ঘটনাটার কথা কারও কাছেই প্রকাশ করব না বলে স্থির করেছিলাম। কারণ প্রথমত, এমন ধরনের গায়েবী রহস্যময় কোন দৃশ্য যেটা স্বপ্নেই হোক বা জাগরণেই হোক– দেখবার মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন অর্থ লুকিয়ে থাকে। যেটা প্রকাশ করে দিলে পরে আর তার কোন মর্তবা থাকে না। দ্বিতীয়ত, চাক্ষুস দেখা রহস্যময় ভৌতিক এই ঘটনার বিবরণ শোনামাত্রই স্থানীয় লোকের মধ্যে দারুণ আতংকের সৃষ্টি হবে এবং পরবর্তীতে এই গোরস্তানের ধারেকাছেও কেউ ঘেঁষতে তো চাইবেই না; পরন্তু সংলগ্ন এই মসজিদটাতেও মুসল্লী সমাগম কমে যাবে। বিশেষ করে

মাগরেব এবং পরবর্তী এশা বা তারাবীর নামাজের জন্য লোকজন আর এই মসজিদে আসবে না। তা ছাড়াও বিষয়টার গভীর তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য আরও কিছুটা সময় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হলো আমার। এহ্‌তেকাফ শেষ হতে এখনও বেশ কয়দিন বাকি। এরমধ্যেও তো অমন আরও ভৌতিক কাণ্ড কারখানা ঘটতে পারে গোরস্তানে। সম্ভাব্য সেই রহস্যময় কাণ্ডকারখানা কেমন হয় দেখাই যাক না। এমনও তো হতে পারে ওই অলৌকিক ঘটনাটার কথা বাইরে প্রকাশ করে দিলে যদি মারাত্মক কোন অঘটনের শিকার হই আমি! কাজেই নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার স্বার্থেই বিষয়টা চেপে গেলাম।

চব্বিশ রমজানের দিন শেষ হয়ে রাত নেমে এল। সারাদিন অসংখ্যবার ওই ভৌতিক দৃশ্যটার ছবি আমার মনের পর্দায় ভেসে বেড়িয়েছে। তাই আঁধার গাঢ় হওয়ার সাথে সাথে আমার ভিতরে গত রাতের ওই ভয়টা উথলে উঠতে চাইল। কী জানি রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য আবার না জানি কেমন ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে আছে।

কিন্তু না, সেরকম কিছুই আর ঘটল না সে রাতে। ভয় ভয় ভাবটাও ধীরে ধীরে কেটে গেল। নির্বিঘ্নে একাগ্রচিত্তে এবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিলাম চব্বিশ রমজানের দিবাগত ওই রাতটা। শুধু ওই রাতটাই না। এহ্‌তেকাফ চলাকালীন পরবর্তী আর কোন রাতেই ওরকম কোন রহস্যময় ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হলো না আমাকে।

দীর্ঘ চার মাস চেপে রাখবার পর কৌতূহলবশেই একদিন ওই ঘটনাটার কথা আমি আমার হুজুরকে জানাই। হুজুর শুনে

আশ্চর্য হন। বলো কী? এ রকম ভৌতিক ব্যাপার মসজিদ সংলগ্ন গোরস্তানে ঘটতে পারে, যেখানে দিন রাত পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচবার আজান দেওয়া হয়। নিশ্চয়ই ওটার পেছনে কোন লুকানো রহস্য আছে।

আর সেই লুকানো রহস্যটা উদ্‌ঘাটনের জন্যই আমার হুজুর 'ইস্তেখারা' করে দেখবার সিদ্ধান্ত নিলেন ওই দৃশ্যটার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে। উনি সাত দিনের সময় নিলেন। এর মধ্যেই 'ইস্তেখারায়' বসবেন। এবং দেখবেন আসলে কী ব্যাপার লুকিয়ে আছে অমন ভৌতিক ঘটনার পেছনে।

কিন্তু হুজুরের সে প্রচেষ্টা আর সফল হলো না। একবার নয়, পর পর তিনবার 'ইস্তে-খারায়' বসেও হুজুর সেই লুকানো রহস্যের কোন কূলকিনারা করতে পারলেন না।

দুই

বিষয়টা আমার মনের মধ্যেই চাপা থেকে গিয়েছিল। অনেকদিন অনেকভাবেই আমি অলৌকিক ঘটনাটার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি। কিন্তু কোন হদিস বের করতে পারিনি। ওই এলাকার আশপাশ দু'দশ গ্রামের মধ্যে এমন কোন মশহুর আলেম ওলামা নেই যে যার কাছে গেলে এই ঘটনার কোন যুৎসই ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাব। আর যেখানে আমার পীর সাহেব হুজুরই ব্যর্থ হলেন সেখানে অন্য এমন কেই বা আছেন যে আমার এই অলৌকিক ঘটনার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে পারেন?

এভাবে আরও বছর খানেক কেটে গেল। ওই ঘটনার স্মৃতি

তখন আস্তে আস্তে আমার মন থেকে মুছে যেতে শুরু করেছে। আর তখনই হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেল পাশের গ্রামের এক বৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে। নাম তাঁর ইয়াসিন আলি। বয়স একশো ত্রিশ বছর। হতেও পারে একশো ত্রিশ। যদিও চেহারায় সেটা ভালভাবে বোঝা যায় না। আমার বাসস্থানের পাশের গ্রামেই যে এত বেশি বয়স্ক একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি আছেন, সেটা আমি জানতামই না; ভেবে নিজেকে কেমন জানি ছোট মনে হতে লাগল। হাজার হোক, এরকম লোক তো শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের কাছ থেকে দোয়া নিলে পরকালে নিজেরই মঙ্গল হয়। আমি যে মঙ্গল থেকে এতদিন বঞ্চিত থেকেছি।

যা হোক, উনি খুব কষ্ট করেই আমার কাছে এসেছিলেন ওঁনার ব্যক্তিগত একটা বিষয়ে সৎ পরামর্শের জন্য। পরিচয় হওয়ার পর তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা জানলাম আমি। ইয়াসিন আলির বয়স অনেক হলেও, শরীরের বাঁধন এখনও বেশ শক্ত আছে। হাঁটতে চলতে নাকি তেমন একটা অসুবিধা হয় না তাঁর। তবে কথা বলেন খুব ধীরে ধীরে। চিবিয়ে চিবিয়ে। অনেকটা মেপে মেপে কথা বলবার অভ্যাস। অতিরিক্ত কথা আদৌ বলেন না উনি। তা ছাড়া বেশ পরহেজগারীও টের পেলাম তাঁর পোশাক-আশাক আর চলাফেরার ভাবগতিক দেখে। বাড়িতেই থাকেন বেশির ভাগ সময় ইয়াসিন আলি। বাইরে খুব একটা বের হন না।

বৃদ্ধ ইয়াসিন আলির কাছ থেকে অনেক বিষয়ে অনেক খবর জানতে পারলাম আমি। বিশেষ করে অত্র মহল্লার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান দেখলাম টনটনে। যেন জীবন্তই এক ইতিহাস তিনি ওই এলাকার। তাঁর বাপ-দাদা সাত পুরুষ থেকে এ এলাকায় বসবাস করে আসছেন। কিছু স্বচক্ষে দেখা,

কিছু কিছু বাবার মুখ থেকে শোনা। আবার দাদা-পরদাদাদের বলা ঘটনাগুলোর প্রায়ই তাঁর ঠোঁটস্থ। সে সব কাহিনী এই অঞ্চলের প্রতিটা লোকের, তাদের পূর্ব পুরুষদের। এ ছাড়াও এই মসজিদ আর মসজিদ সংলগ্ন বিরাট ওই গোরস্তানটার অনেক ইতিহাসও তাঁর জানা। প্রায় সোয়া দুইশো বছরের প্রাচীন এই মসজিদের অনেক ইতিহাসই শোনালেন বৃদ্ধ ইয়াসিন আলি।

হিজরী ১১২৫ সালে জয়নাল খাঁ নামের এক ধনী ব্যক্তি এই মসজিদটা নির্মাণ করেছিলেন। সেই সাথে সংলগ্ন বিরাট এলাকার উপর ওই গোরস্তানটা। জয়নাল খাঁ নিঃসন্তান ছিলেন। মারা যাবার পর তাঁর সব জায়গাজমি বেহাত হয়ে যায়। আশপাশের লোকেরা ছলে বলে নানা কৌশলে সেগুলো দখল করে নেয়। শুধু ওয়াক্‌ফ করে নেওয়া মসজিদ, গোরস্তান আর গোরস্তান সংলগ্ন কয়েক একর জমিই শুধু অবশিষ্ট থাকে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত গোরস্তানের আকারও বাড়তে বাড়তে ওয়াকফ্ করে নেওয়া জমিরও অনেক খানিকই গোরস্তানের দখলে চলে গেছে।

গোরস্তানটিতে নাকি পাঁচ হাজারেরও বেশি লোকের কবর আছে। সেই থেকে বর্তমান পর্যন্ত অত্র এলাকার আট-দশটা গ্রামের যত মানুষ মারা গেছে তাদের প্রায় সকলেরই কবর হয়েছে এই গোরস্তানে। শিশু থেকে বুড়ো পর্যন্ত কত যে ভালমন্দ, চোর ডাকাত, জ্ঞানী-গুণী, পরহেজগার, অপরহেজগার লোকের হাড়-হাড্ডি মিশে গেছে এই গোরস্তানের মাটিতে তার সঠিক হিসাব কী কেউ করতে পারবে। কথাটা বলতে গিয়ে যেন আবেগী হয়ে উঠলেন ইয়াসিন আলি। তা ছাড়া জয়নাল খাঁর কবরটাও এই গোরস্তানের উত্তর-পশ্চিম কোণায় পাকা করে

বাঁধিয়ে সংরক্ষিত করা আছে।

এই কবরে শুয়ে আছেন অনেক আলেম ওলামা, সুফি পরহেজগার ব্যক্তিরাও। যাঁরা এক সময় তাঁদের সাধুতা আর আধ্যাত্মিক গুণাবলীর প্রয়োগে অনেক রোগ শোক আর বিপদ আপদে পতিত হওয়া দুঃস্থ লোকদেরকে উদ্ধার করেছেন। সঠিক জীবনের নিশানা দেখিয়েছেন। দিয়েছেন বাঁচবার প্রেরণা। আজ তাঁরা নেই কিন্তু আছে তাঁদের স্মৃতি। এ কালের ছেলে-যুবা, প্রৌঢ়রা না জানলেও বেশি বয়সের অনেক বুড়োবুড়ির স্মৃতিতে তা ধরা আছে অবলীলায়। কিছুকাল আগেও বিশেষ কতগুলো মুসলিম পর্বে যেমন শবে বরাত, শবে মেরাজ বা শবে কদরের রাতে মোমবাতিতে মোমবাতিতে ভরে যেত এই গোরস্তানের সারা আঙিনা। জোনাকজ্বলা আলোর মত অনেক রাত অবধি টিপ টিপ করে জ্বলত সে সব মোমবাতির শিখাগুলো। ওগুলো ছিল ওইসব পুণ্যাত্মাদের প্রতি ভক্ত মানব-মানবীর হৃদয় উৎসারিত শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা। কিন্তু এখন আর জ্বলে না সে সব মোমের শিখা ওই সব পর্বগুলোতে। কারণ, অনেকটা দীর্ঘনিঃশ্বাস জড়িত ক্ষোভের সাথেই বললেন ইয়াসিন আলি; মানুষ এখন গোমরাহ হয়েছে। হয়েছে চালাক। হয়েছে ধূর্ত। কাজেই বিশেষ পর্বে মোম জ্বালানো বাড়তি আদিখ্যেতা বলে মনে করে ওরা।

মসজিদ সংলগ্ন এই গোরস্তানে নাকি অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে অতীতে। যেগুলোর কিছু কিছুর সাক্ষী ইয়াসিন আলি নিজেও। এই গোরস্তানে নাকি ফেরেশতাও মানুষের বেশ ধরে নেমে আসত এক সময়। গভীর রাতে অনেক পরহেজগার পুণ্যবান ব্যক্তি তা নিজ চোখে দেখেছেন। তেমন ব্যক্তিদের দেখা কতক কতক অলৌকিক অবিশ্বাস্য ঘটনার বর্ণনাও শোনা

গেল বৃদ্ধ ইয়াসিন আলির মুখ থেকে। অলৌকিক, ভয়ঙ্কর আর বীভৎস সে সব দৃশ্য দেখে মুহূর্তে পিত্তি গলে মারাও গিয়েছে এমন অনেক অপমৃত্যুর ঘটনার কথাও বললেন এই বৃদ্ধ।

বারো চান্দের বিশেষ বিশেষ রাতে পুরানো অনেক গোরস্তানেই পাহারাদার জিন ঘুরে বেড়ায়। মসজিদে নামাজও পড়ে। বিশেষত শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে আসে পরহেজগার জিনেরা। জয়নাল খাঁ-র এই গোরস্তানেও জিনের আনাগোনা ছিল, বলল ইয়াসিন আলি। আর ওরা মাঝেমধ্যেই শেষ রাতে নামাজ পড়তে চলে আসত সংলগ্ন এই মসজিদটাতে। অনেক জ্ঞানী আর সাহসী মুসল্লীদের তা নজরেও পড়ত শেষ রাতের তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে যেয়ে। ওদের জন্য নাকি মসজিদের সদর দরজা খোলা রেখে নামাজীরা ভিতরে গিয়ে ঢুকতেন যাতে ওই নামাজী জিনেরাও সহজে মসজিদে ঢুকে যেয়ে মুসল্লীদের পেছন পেছন নামাজে দাঁড়াতে পারে। অনেক মুরুব্বীর কাছ থেকেই এ বিষয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে অতীতে।

এ ছাড়াও মৃতের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনাও নাকি ঘটেছে এই মসজিদ সংলগ্ন গোরস্তানে। খাটিয়ার উপর থেকে অলৌকিকভাবে লাশ উধাও হয়ে গিয়েছে। কথাটা বলতে গিয়ে হঠাৎই যেন ফর্সা উজ্জ্বল মুখমণ্ডলটা নিমেষেই বিষাদের কালো ছায়ায় ঢেকে গেল ইয়াসিন আলির। আমি বিস্ময় আর কৌতূহল মাখা দৃষ্টিতে তাকালাম বৃদ্ধের দিকে। তারপর যে কাহিনীর বয়ান শুরু হলো ওই বৃদ্ধ ইয়াসিনের মুখ দিয়ে; মনে হলো ঠিক ওই রকম একটা ঘটনার বর্ণনা শুনবার জন্যই যেন আমি এতদিন ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি।

বাংলা ১২৪৬ সাল। আমার বয়স তখন সতেরো বছর। ছোট দাদা আবদুল কাদের খান মারা গেলেন একশো উনিশ বছর বয়সে। আমাদের বংশের প্রায় সকলেই শতায়ু। ছোটদাদাও একশো ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। উনি খুব ধার্মীক মানুষ ছিলেন। সহজ সরল। তবে শরীয়তের নিয়মকানুন খুব একটা মেনে চলতেন না। মারফতী লাইনের ফকির ছিলেন উনি। অনেকেই নাড়ার ফকির বলে ঠাট্টা বিদ্রূপও করত ওঁনাকে। চিশতীয়া তরিকার মুরীদ ছিলেন বলে গান-বাজনাও করতেন আমার সেই ছোটদাদা।

অবশেষে ফকির কাদের মারা গেলে তাঁর জানাজা পড়া নিয়ে বিরাট সমস্যা দেখা দিল। কিছু কাঠমোল্লা ফতোয়া দিলেন তাঁর জানাজা পড়া যাবে না, কারণ তিনি গান-বাজনা করতেন। পার্শ্ববর্তী তিন মাইল দূরের সুলতানপুর গ্রামের মৌলবী আহাম্মদ আলির কানে যখন গেল ফকির কাদির খাঁর মৃত্যু সংবাদ এবং পাশাপাশি এলাকার গ্রাম্য মোল্লা মৌলবীদের তার জানাজা না পড়ানোর ওই নিষেধাজ্ঞা শুনে দারুণভাবে ব্যথিত হলেন মৌলবী সাহেব। কী! এটা কেমন কথা? এও কী হয়? একজন মুসলমান, হোক না সে বেনামাজী. তাই বলে মরবার পর তার জানাজা হবে না, এটা হতে পারে না। তার বাপদাদা চোদ্দপুরুষ তো কলেমা পড়েই মুসলমান হয়েছিল।

তিনি তাঁর দলবল, সঙ্গীসাথীসহ তখনই ছুটে এলেন রামচন্দ্রপুর গ্রামে ফকির কাদির খাঁর বাড়ি। তখন মাঝরাত। নিজের সঙ্গের লোকজন, সঙ্গীসাথী আর খাঁ বাড়িতে অপেক্ষারত সকল লোকজনদেরকে নিয়ে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ দ্রুত সেরে তিনি রাতের শেষ প্রহরের দিকে মুর্দাসহ হাজির হলেন

জয়নাল খাঁর গোরস্তানে।

গোর খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। লাশ কবরে নামানো হবে এমন সময় গাঁয়ের একদল লোক এসে হাজির হলো ওই গোরস্তানে। সাথে স্থানীয় মোল্লা, মুন্সীসহ ওই গাঁয়ের মাতবর আরশাদ আলি। ওরা কীভাবে যেন খবর পেয়ে গিয়েছিল সুলতানপুরের আহাম্মদ মৌলবী এসে কাদির ফকিরের লাশের জানাজা পরিয়ে দাফন করবার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। তাই সমবেতভাবে বাধাদান করে দাফন কাজ ভণ্ডুল করতেই ওদের এত রাতে গোরস্তানে উপস্থিতি।

আহাম্মদ মৌলবীও আনাড়ি আলেম না। সহজেই বুঝে ফেলেছেন ওদের কুচক্রান্ত আর মনোভাব। তিনি তাঁর লোকজনসহ লাশ কবরে নামানোর প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। আর তখনই শুরু হয়ে গেল দুই দলের মধ্যে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা। কথা কাটাকাটি। একদিকে লাশ দাফন করবার পক্ষের আহাম্মদ মৌলবী আর তাঁর দলবলসহ কাদির ফকিরের পীর ভাইয়েরা। অপর দিকে গাঁয়ের মাতবরসহ গ্রামবাসী আর কাঠ মোল্লা-মুন্সীর দল।

এক পক্ষ ফতোয়া দিচ্ছে কাদির খাঁ ফকির ফাসেক, ভণ্ড, অমুসলমান। জীবনে কখনও পশ্চিম মুখে মাথা কাত করেনি সে। বেনামাজী। মুসলমানী মতে ওর সৎকার চলে না। অপর পক্ষ জোর গলায় ফতোয়া দিচ্ছে কাদির ফকির অবশ্যই একজন মুসলমান। এবং অতি খাঁটি, সৎ, সুফি মুসলমান। মারফতি লাইনে জ্ঞানী, বুজুর্গ ব্যক্তি। এমন মহৎ ব্যক্তির পবিত্র লাশ মুসলমানী মতে দাফন না করে এর প্রতি কোনরকম বেয়াদবি করলে তার পরিণতি অবশ্যই গ্রামবাসী সকলকেই ভোগ করতে হবে একদিন।

দু'দলের মধ্যকার বাক্‌বিতণ্ডা, তর্কাতর্কি যখন তুঙ্গে তখনই ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা।

দেখলাম বৃদ্ধ ইয়াসিন আলির চোখ, মুখ মুহূর্তে কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভিতরের উৎফুল্ল ভাবটা যেন চেপে রাখতে পারছেন না। প্রচণ্ড ঔৎসুক্য আর ব্যগ্রতা আমাকেও গ্রাস করেছে তখন পুরোপুরি। জিজ্ঞাসা করলাম– কী ঘটল চাচা? বলুন। বলুন আমাকে!

ইয়াসিন আলির উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে যেন অপার্থিব এক প্রশান্তি রেখা ফুটে উঠল। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলল, দেখলাম ইয়া বড় বড় দুইখান হাত শূন্য আসমান থেইকা নাইমা আসছে নীচে। তারপর দুই পাশ থাইকা পাঁজা কইরা ধইরা খাটিয়ার উপরে শোয়ানো ছোটদাদার কাফন পরানো লাশটারে যেন আস্তে আস্তে উপরের দিকে ওঠাইতে লাগল। তারপরে ওঠাইতে ওঠাইতে এক সময় শূন্যে মিলাইয়া গেল সব। কাক জোছনা আর সেই সাথে মশালের আলোতে ওপরে যতদূর দেখা যায় দেখলাম।

উপস্থিত সব লোকজনও নাকি এ বিভীষিকাময় ভৌতিক দৃশ্য দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে সবাই বাকহীন। পরস্পর বাকবিতণ্ডা, তর্কাতর্কি ওদের নিমেষেই হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মুহূর্ত কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল সবাই ওই গোরস্তান এলাকা থেকে।

উত্তেজনায় ইয়াসিন আলি যেন হাঁপাচ্ছিলেন। ওঁর বলা কথাগুলো শেষ হলে আমি আবারও তাকালাম বৃদ্ধের মুখের দিকে। বললাম, মুরুব্বী আপনার বয়স অনেক। জীবনের শেষ প্রান্তে ঠেকেছেন। এক পা কবরে, এক পা ডাঙায়। নিশ্চয়ই এই বয়সে কেউ মিথ্যা, বানানো কথা বলে না। তবুও আবারও

বলছি আপনাকে—আপনার-এ বলা ঘটনাটা কি আদতেই সত্যি?

বৃদ্ধ ইয়াসিন আলি এবারে দু'হাত উপরে উঠিয়ে আল্লাকে সাক্ষী করে জোর গলায় বলে চললেন, এই শ্যাষ বয়সে আল্লার নামে কিরা কাইট্যা কইতাছি আমার বলা এ ঘটনাটা একদম সত্য। একবিন্দুও মিথ্যা না।

বৃদ্ধ ইয়াসিন আলির বলা কথাগুলোর সাথে আবারও আমি আমার সেই রাতের দেখা ভৌতিক দৃশ্যটা মিলিয়ে নিতে থাকলাম।

মোঃ শাহাবুদ্দিন

শিকড়

সম্প্রতি অসুখটা দেখা দিয়েছে আমার। যে গভীর ঘুম নিয়ে গর্ব ছিল একসময়, আজকাল সেই ঘুমের জন্যই দিবারাত্রি প্রার্থনা জানাই। ঘুম নেই, ঘুম আসে না রাতে। যদিও বা হঠাৎ করে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, মুহূর্তমধ্যে ভয়াবহ সব দুঃস্বপ্নে চিৎকার করে জেগে উঠি। জেগে উঠে কুলকুল করে ঘামতে থাকে সমস্ত শরীর। শীত শীত বোধ হয়। শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে।

সেই একই ব্যাপার সমস্ত রাতে। অন্য কেউ নয়, আমি নিজেই আমার প্রতিপক্ষ। সেই একই দৃশ্য বার বার ভেসে ওঠে আমার চোখে– বিশাল এক মাঠের মাঝে ততধিক বিশাল এক বটবৃক্ষ। চারদিকে ছড়ানো তার শিকড়গুচ্ছ, সম্ভবত কয়েক একর জুড়ে। তার নিচে গভীর ছায়ায় আমি শুয়ে আছি, এবং শুয়ে থাকতে থাকতেই আমার হাত-পা, জিভ, নাক, কান প্রভৃতি অঙ্গ থেকে সাপের মত কিলবিল করে ছড়িয়ে যাচ্ছে শিকড়। যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছেই। অক্টোপাশের ভূতের মত সেই বহুমুখী বিস্তৃত শিকড় ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে পেতে সমস্ত মাঠ যেন আবৃত করে পার্শ্ববর্তী জনপদ, লোকালয় গ্রাস করতে চায়।

এ পর্যন্তই রোজ দেখি। এরপর প্রচণ্ড ভীতি গ্রাস করে আমাকে। আচমকা ঘুম ভেঙে যায়–ধড়মড়িয়ে জেগে উঠি। প্রচণ্ড

পিপাসায় ঢক্‌ঢক করে পানি পান করে শীতার্ত বোধ করি। এ পর্যন্তই। একথা কাউকে বলি না, বলা যায় না। কারণ কে বিশ্বাস করবে আমার কথা? আমার স্ত্রী আমার অনিদ্রার কথা জানে। রাতে ঘুমের বড়ি খাওয়ার কথা বার বার মনে করিয়ে দেয়। শোবার আগে আমি নিয়মিত বড়ি খেয়েও ঘুমাই। তবুও এই একই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই নেই। প্রতিরাতেই এই একই দৃশ্য আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

রাত দুটো, তিনটে বা চারটে– জেগে ওঠার পর আর ঘুম হয় না। পাশের রুমে আমার স্ত্রী তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ছেলেমেয়েরা যে যার ঘরে আরামের ঘুমে নিমজ্জমান। শুধু ঘুম নেই আমার চোখে। নিদ্রাহীন রাতের যন্ত্রণা আমাকেই একাকী ভোগ করতে হয়।

প্রথম প্রথম সাধারণ চিকিৎসক দেখিয়েছি। দেখিয়েছি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নানান প্রেসক্রিপশন, নানান ওষুধপত্র চলেছে। কোন কাজ হয়নি। এরপর গেছি মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। তাঁর চেম্বারে দিনে, রাতে বহু সিটিং দিয়েছি। সম্মোহিত করে তিনি আমার মনের জটিল গহ্বর থেকে রোগের উৎপত্তিস্থল ধরার চেষ্টা করেছেন এবং প্রতিবারই ধরি ধরি করেও ধরতে পারেননি বলে আফসোস করেছেন এবং এখনও সেই ধরাধরি বা লুকোচুরির খেলাই চলছে আমাদের মধ্যে।

আমি নিজেও অনেক ভেবেছি। কিন্তু কোথা থেকে উৎপত্তি এই দুঃস্বপ্নের, অনেক ভেবেও তা বের করতে পারিনি। মনোবিশারদ অবশ্য বলেন, মনই যতসব বিদঘুটে রোগের আকর। মানুষের মনের গভীরতার কোন সীমা পাওয়া যায় না। তা পৃথিবীর যে কোন মহাসাগরের গভীর গভীরতম খাদের

থেকেও গভীর। আর এই গভীরতার কোথায় কোন শূন্যতায় ঝুলে থাকা কোন্ ঘটনা বা স্মৃতি কখন, কিভাবে, কোনরূপ নিয়ে আমাদের স্বপ্নে উদ্ভাসিত হয়, তার ব্যাখ্যা পাওয়া অত্যন্ত জটিল ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং সেই ঘটনা বা স্মৃতি যতদিন না ছিঁড়েখুঁড়ে পড়ে যায়, ততদিন হয়তো এ ধরনের দুঃস্বপ্ন ভাসবে চোখের সামনে। দরকার শুধু গভীর ঘুমের। তাহলেই আর বিসদৃশ দৃশ্য দেখতে হবে না। এবং এই পরামর্শ মতই রাতে, প্রতিরাতে ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমোতে যেতে হয় আমাকে; কিন্তু তাতেই বা স্বস্তি কোথায়? মাঝে মাঝে সেই একই দৃশ্য ভেসে ওঠে; আর আমি অস্বস্তিতে ভুগতে থাকি।

দিনে অবশ্য কোন ঝামেলা থাকে না। ভোর হতে না হতে উমেদারের দল ভিড় জমায় ড্রয়িংরুমে। একেকজনের এক এক আবদার। কারও চাকরি, কারও লাইসেন্স, কারও পারমিট, কারও বাড়ি দখল, কারও খাসজমি দখল, ইত্যাদি ইত্যাদি কাজে সহায়তা দান। আমি এলাকায় সংসদ সদস্য। তারা ভোট দিয়ে আমাকে সদস্য বানিয়েছে; সুতরাং সবার দাবি আছে আমার উপর। সরাসরি না বলা যায় না। কারণ এদের ভোটের উপর আমাকে আবার নির্ভর করতে হবে। কাজেই কিছু না কিছু কাজ করতেই হয়; বরং বলা যায়, করতে বাধ্য হই। যদিও জানি এর মাঝে কিছু অন্যায়ও হয়ে যায়। সেজন্য বিবেকের দংশন সহ্য করতে হয়। অনেক নিরপরাধ মানুষ আমার অজান্তেই দণ্ডিত হয়ে পড়ে। আর সম্ভবত তাদের অভিশাপেই আজ আমার এই অবস্থা। ঘুম হয় না। দুঃস্বপ্নে জেগে উঠি।

কিন্তু বারবার একই স্বপ্ন কেন? সেই বিশাল মাঠ। সেই বটগাছ। দেখতে দেখতে দৃশ্যটা আমার এতই পরিচিত হয়ে গেছে যে একবার মাত্র বাস্তবে দেখলেই আমি চিনে ফেলব

স্থানটা। সমগ্র- বাংলাদেশে এটা অতি স্বাভাবিক এক দৃশ্য। কোথাও না কোথাও দেখা যাবেই। আমি আমার ট্যান্ডেলদের কাছে এ ধরনের কোনস্থান আমার এলাকায় আছে কি না, সে ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে বলেছি। এক বিশাল মাঠের মধ্যে সুবিশাল ও সুপ্রাচীন বটবৃক্ষ- এই সেই স্থান। কেন জানি না, কোন এক অমোঘ আকর্ষণে বার বার আমাকে টানছে সেই দৃশ্যটা। আমি স্থির করে ফেলেছি- খবর পাওয়া মাত্র দেখতে যাব।

খবরও পেলাম কিছু দিনের মধ্যে। আমারই নির্বাচনী এলাকায় প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল তালসরের বিলের মধ্যিখানে সেই ধরনের একটা বটগাছ আছে। নামেই কেবল বিল। বর্ষায় সামান্য পানি থাকে- অন্যান্য সময় শুকনো মাঠ। এলাকাটা লবণাক্ত বলে কোন শস্যই হয় না। বিরান মাঠ ধুধু করে কাকজ্যোৎস্নায়। তবে পথ খুবই দুর্গম। মেঠো এবড়োখেবড়ো পথে জীপ ছাড়া অন্য কোন বাহন যাবে না- তাও অনেক কায়ক্লেশে।

তবুও গোঁ ধরলাম যাবই। সম্ভবত নিয়তির টান, এড়াই কি করে? যে খবর এনেছিল, তাকে সঙ্গে করে, আমার নিজস্ব দুইজন সশস্ত্র দেহরক্ষী নিয়ে জীপে বের হলাম, ড্রাইভার সহ পাঁচজন। মনে মনে একটা হিসেব ছিল- ঘণ্টাচারেক লাগবে পৌঁছতে।

পাকা রাজপথে ঘণ্টা দুয়েক, তারপর কাঁচা পথে তিনঘণ্টা। বিকেল তিনটে নাগাদ পৌঁছে যাবার কথা! কিন্তু প্রথমেই পথে বাধা। গাটির ঘাটের পথে এক ট্রাক কাপড়ের গাঁটসহ উল্টে রোড ব্লক। সেখানেই খেয়ে গেল দুই ঘণ্টা। এরপর কাঁচাপথে যখন নামলাম, তখন বেলা দুটো ছুঁই ছুঁই করছে। পৌষের ধানকাটা মেঠোপথ দিয়ে আমাদের জীপ ছুটছে লাফাতে লাফাতে। আদিগন্ত নগ্ন মাঠ। দূরে গ্রামের সবুজ তটরেখা নজরে আসে।

মাঠের কোথাও কোথাও জমে আছে স্তূপীকৃত ধান গাছ। গরুর গাড়ি ক্যাঁচোর কোঁচর করে খড়ের বোঝা টানছে। দূরে দূরে ধানগাছের কাটা নাড়ায় আগুন দিয়ে খেত পোড়াচ্ছে। সেই নীলাভ ধোঁয়া চুঁইয়ে চুঁইয়ে ওঠার চেষ্টা করছে শীতের ভারী আকাশে। দেখছিলাম একমনে।

–সার দেখি থম্ ধরে গেলেন। পথ প্রদর্শক টাউট ধরনের লোকটির কথায় বিরক্ত হই। আমেজটা নষ্ট হয়ে গেল। ছোটবেলার যে ছবিটা মনের শ্লেটে অস্পষ্ট উঁকি দিচ্ছিল, মুছে গেল তার কথায়।

–দেখছি! কতদিন এভাবে বিনাস্বার্থে গ্রামে ঘুরিনি তো।

–যা করেছেন সার। লাক কথার এক কথা! আমাদের চোখ থেকেও অন্ধ! মাঝে মাঝে এমুনধারা ঘুরলি দিব্যদৃষ্টি খোলে। লোকটার কথায় দর্শনের গন্ধ।

–বাহ, বেশ বলেছ তো! লাখ কথার এক কথা।

–কী যে বলেন সার। আমরা মুরুক্ষু মানুষ! হঠাৎ যা মনে আসে, বলে ফেলি। আপনাদের মত সভাজমানো দামী কথা কোথায় পাব! কষ্ট হতেছে সার?

–নাহ্! কষ্ট হচ্ছে না আবার? তবুও চেপে গেলাম।

লোকটা সম্ভবত বেশি কথা বলে। বলেই চলেছে ধীরে ধীরে,– তা জায়গাটা সার দেখার মত। শুধু বিলেন মাঠ– মধ্যিখানে সেই আদ্যিকালের বটগাছ। তা দুই তিনশো বছর বয়স তো হবেই। নিচে পেরকাণ্ড এক কালা পাথর। নমশুদ্দুরদের কী জানি দেবতা। সিন্দুরের ফোঁটা দেয়া সেই পাথরে। মাঝে মাঝে ঢাকঢোল বাজিয়ে অনেক লোক পুজো দিতি আসে। তয় সব কাজ দিনি দিনি। সন্ধের পর কেউ থাকে না হোথায়!

–কেন বল তো?

–কী যেন সব ভূতপেরেত অপদেবতার ভয় আছে। পথ ভুলে যারাই একবার রাতে উখেনে যেয়ে পড়েছে, তার রেহাই নাই। হয় ভূতের হাতে মরে, নয় ভয়ে পাগল হয়ে যায়–দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

কথায় কথায় কখন যে শীতের বেলা পড়ে এসেছিল জানি না। গন্তব্য তখনও অনেক দূর। একজন দেহরক্ষী মিন মিন করে,–সার, এখনও অনেক পথ, যেতে সন্ধে হয়ে যাবে। বরং গাড়ি ঘুরোয়ে আজকের মত তোজাম চেয়ারম্যানের বাড়ি গেলে হয় না?

–যত্তোসব ভীতুর ডিম। আমাদের ট্যান্ডেল সাহেবের গালগল্পে ভয় পেয়েছ দেখি! তোমাকে তো আর সঙ্গে রাখা যায় না। ধমক দিলাম আমি!

গোঁ গোঁ করে সেকেন্ড গীয়ারে টান দিয়ে জীপ একটা উঁচু আধভাঙ্গা কালভার্টের উপর ওঠার চেষ্টা করছিল। সন্ধ্যার প্রাক-গোধূলির আলোয় সামনের দৃশ্য ঝাপসা এখন। ধান গাছের গোড়া পোড়ানো ধোঁয়া ও আবছা কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে চারদিক। কালভার্টের নিচে জমা পানিতে মাছ শিকাররত কুঁজবক জীপের গোঁ গোঁ শব্দে উড়াল দিয়েছে আগেই। অনতিদূরের জমাট বাঁধা দৈত্যের মত অন্ধকারের দিকে আঙুল তুলে সেই লোকটা মাপা মাপা স্বরে জানাল,–ওই যে, সার। ওই দেখা যায় বটগাছটা। আসে গেছি পেরায়।

আর সেখানেই কালভার্টে উঠতে গিয়ে হঠাৎ টাল খেয়ে আমরা সবাই জীপসুদ্ধ উল্টে গেলাম খাল ছাড়িয়ে মাঠে। মরণ আর্তনাদ দু'তিনজনের। তারপর থেমে থেমে গোঙানি। আমিও প্রচণ্ড চোট পেয়েছিলাম ডানহাতে– সম্ভবত ভেঙেছে কনুইয়ের উপর। বামহাত দিয়ে ডানহাতটা চেপে কোনরকমে উঠে বসতে

চেষ্টা করলাম। দেহরক্ষী দুজনেই জীপের মাঝে আধা-আধি বের হয়ে মৃতবৎ, মারাও যেতে পারে । ড্রাইভার দূর থেকে লেংচাতে লেংচাতে খবর নিতে এল। আর আমার খবর-আনা মানুষটি কোথাও নেই। হয়তো মাথায় বাড়ি খেয়ে খালের পানিতে তলিয়ে গেছে।

—সার বসেন খানিক! আমি কাছের গ্রামে সংবাদ দিয়ে আসি। বলেই ড্রাইভার আমার অনুমতির তোয়াক্কা না করে লেংচে লেংচে পা চালাল উল্টোপথে। বুঝলাম ভীতু লোকটি পালাতে চায়।

আমি হতভম্ব। একটা নিঃসীম শূন্যতা সমস্ত চরাচর জুড়ে। এমন কি ঝিঁঝির শব্দও যেন কর্ণগোচর হচ্ছে না, এমনই স্তব্ধতা। সন্ধ্যা পার হয়ে রাত নেমেছে তখন। দূরে শৃগালের হুক্কাহুয়া রব শোনা গেল। সেই সাথে গ্রামসীমানায় কুকুরের অস্পষ্ট ঘেউ ঘেউ। আমি স্থবির বসে। ভাঙা হাতের যন্ত্রণার আভাস আমার বোধশূন্য খালি হয়ে যাওয়া মস্তিষ্কে কোন দাগ কাটতে পারছে না।

কতক্ষণ সেভাবে বসেছিলাম জানি না, তবে এবার মানুষের কণ্ঠ, সেই ট্যান্ডেল,—সার কি জেগে?

—উঁ! কে?

—আমি তমিজুদ্দী। অন্ধকারে আর এক জমাট অন্ধকার।

—কি বলছ?

—যাবেন না? ওই তো দেখা যায় সেই বটগাছ। চলেন যাই।

দপ্ করে অদূরে জ্বলে উঠল আলেয়া। সেই আলোয় পথ দেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তমিজুদ্দীর পিছন পিছন। সেই জমাট অন্ধকারে মনুষ্যাকৃতি তমিজুদ্দীকে যেন অপার্থিব কোন চলমান বস্তু হিসাবে মনে হচ্ছিল আমার।

—সার কি ভয় পাতেছেন? অন্ধকারে ভেসে এল তার কণ্ঠস্বর।

—না।

তবে! এই না হলি শাবাশ! সেই কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ।

–আমি ভয় পাইনে! এগিয়ে চলো। দেখি কোথায় সেই বুনোদের দেবতা!

–প্রায় আসে গেছি সার। বটগাছের গোড়ায়! চলেন দেখবেন।

তারপর একসময় ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম জমাটবাঁধা অন্ধকারে দণ্ডায়মান বটবৃক্ষের বিশাল কাণ্ডের গোড়ায়। বসলাম। আশেপাশে ফিসফিস শব্দ। শোঁ শোঁ বাতাসের গুঞ্জন। দূরে ঝোপঝাড়ে খসখস শব্দ রাতচরা প্রাণীর। মাঝে মাঝে দপ্ করে জ্বলে ওঠা আলেয়ার আলো। আর সেই আলোয় দেখলাম বুনোদের পূজ্য কালো পাথরের মূর্তিটা। তার মুখচোখে সিঁদুরলেপা। ভয়ঙ্কর বীভৎস এক দৃশ্য। মনে হচ্ছিল সেই অপার্থিব মূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই রাতে। ডাকলাম–তমিজ, তমিজুদ্দী।

কোন সাড়া নেই। নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চারদিক। এই ভয়ানক স্তব্ধতা যেন ভারী হয়ে চেপে বসল আমার ওপর। শিরশিরে এক অনুভব রক্তের গভীরে। এবার সত্যিই ভয় পেলাম।–তমিজ, তমিজুদ্দী– ডাকলাম আবার।

ধুপ ধুপ করে হাতির মত ভারী পায়ের শব্দ! কে আসছে? কোন ভারী জানোয়ার, দৈত্যাকার মানুষ! আমার হৃদপিণ্ড যেন লাফাতে শুরু করল। ধুপ ধুপ করে আবার সেই শব্দ। কাছে এগিয়ে আসছে।

আমার চিন্তাভাবনা অসাড় হয়ে গেছে। চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে অপেক্ষা করছিলাম সেই শব্দের উৎসের জন্যে। তারপর হঠাৎ করে জ্বলে উঠল আলেয়া। খুব কাছেই। এবং তার আলোয় এবার স্পষ্ট দেখলাম পাথরের সেই ভয়াবহ মূর্তিটা আমার বুকের খাঁচার ধারে দাঁড়িয়ে। তার ক্রূর পাথুরে চোখদুটো জ্বলছে প্রচণ্ড

হিংস্রতায়। ব্যস্, এ পর্যন্তই। পরপরই তার ভারী একটা পা উঠে এল বুকের উপর। বুকের খাঁচার হাড় ভেঙে পড়ার প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমি অবশ হয়ে গেলাম। বুঝলাম নাক, মুখ, চোখ দিয়ে রক্তের ধারা নামল দ্রুত। আর আমি সেই সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের নিচে আমারই রক্তের ধারায় ক্রমাগত বিস্তৃত করে চললাম আমার শিকড়।

[পরদিন জনাব... কে খুঁজতে আসা উদ্ধারকারী দলটি অতি প্রাচীন সেই বটবৃক্ষের কাণ্ডের নিচে থেঁতলে যাওয়া মৃতদেহ উদ্ধার করে। তাদের মতে হাতির মত কোন ভারী জানোয়ারের পদতলে পিষ্ট হয়েছিল তাঁর দেহ। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে এতদ্তঞ্চলে হাতি দূরের কথা শিয়াল ছাড়া কোন বন্য জানোয়ার কেউ দেখেনি।

এ বিষয়ে পরবর্তীকালে যে তদন্ত টীম গঠিত হয়, তাদের মতে বটবৃক্ষের গোড়ায় বুনোদের ভারী পাথরের দেবতাটি সম্ভবত জনাব... এর শরীরে পতিত হওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু সেই পতিত পাথরের ভারী মূর্তিটি পুনরায় কে বা কারা যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা কেউ বলতে পারে না। কারণ তিনটন ওজনের এই বিশাল মূর্তিটি নড়ানো দুই দশ জনের কাজ নয়। তাই বিষয়টি রহস্যাবৃতই হয়ে থাকল।]

এহসান চৌধুরী

ডাকিনী

রহিসউদ্দিন সরল সোজা ভীতু মানুষ। বিয়ে-থা করেনি। সংসার ধর্মেরও বালাই নেই। তার বিয়ের ব্যাপারে এত অনিহার কারণ এলাকার মানুষের কাছে এক রহস্য। তার একশো দুই বছর বয়সী মা আজ যাই কাল যাই করে এখনও টিকে আছে। রহিসউদ্দিন নিজের আর বৃদ্ধা মায়ের পেট চালাতে রিকশা ভ্যান টানে। তাতে যা রোজগার হয়, দু'জনের ভালভাবেই উতরে যায় দিন।

আজ সন্ধেবেলা রহিসউদ্দিন আলমডাঙ্গা বাস টার্মিনাল থেকে একটা মোটা ভাড়া মেরেছে। বাবু গোছের তিনজন লোককে বন্ডবিল হাইস্কুলের কাছে পৌঁছে দিয়ে চল্লিশ টাকা পকেটে পুরেছে। বাবু লোকগুলোও বেশ। রহিসউদ্দিন পঁয়ত্রিশ টাকা চাইতেই তারা চল্লিশ টাকা বের করে বলেছিল, 'পাঁচ টাকা তোমার বকশিশ।' রহিসউদ্দিন তো খুশিতে ডগমগ।

রিকশা ভ্যান নিয়ে রহিসউদ্দিন যখন আলমডাঙ্গার পথে ফিরছে, তখন রীতিমত অন্ধকারে ছেয়ে গেছে চারদিক। জনমানবহীন খেত-খামারের মাঝে নিঃসঙ্গতায় ধুঁকছে গ্রামীণ মেঠো রাস্তাটা। এই সময় পথের চারপাশে তাকাতেই কেমন যেন গা শিরশির করে উঠল রহিসউদ্দিনের। এই ভূতুড়ে নির্জন পথ দিয়ে একা যাওয়া কি সম্ভব? ভাগ্য ভাল ভ্যানের নীচে হ্যারিকেনটা

জ্বালিয়ে রেখেছিল। না হলে এই ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে কী যে হত, ভাবাও যায় না।

দ্রুত গতিতে ভ্যান ছোটাচ্ছিল রহিসউদ্দিন। সামনেই বিরাট এক বাঁশ বাগান। তারপরই গোরস্থানটা।

যতই গোরস্থানের দিকে এগুচ্ছে ততই যেন পা দুটো অসাড় হয়ে আসছে তার। ভ্যানও চলতে চাইছে না। চলবে কী করে? পায়ের শক্তিই যদি কমতে থাকে তা হলে কি ভ্যান চলে?

ডাকিনী-যোগিনী! উরি বাপস্! সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে ওসবের নাম শুনলে। আল্লার নাম মনে মনে জপতে লাগল রহিসউদ্দিন।

রহিসউদ্দিনের মনে হলো– তার ভ্যান কেউ পেছন থেকে টেনে ধরেছে।

ঢোক গিলল সে। ঝিঁঝি পোকার ঐক্যতানে কানে তালা লাগার দশা হচ্ছে। আপন মনেই রহিসউদ্দিন ফিস্‌ফিস্ করল, 'হে খুদা, একটা প্যাসেঞ্জার জুটি দ্যাও। এই অন্ধকারে মলাম!'

হঠাৎ চমকে উঠল রহিসউদ্দিন। সামনে ওটা কী দেখা যায়? দুটো বউ না? ওই যে বাঁশ বাগানের তলে দাঁড়িয়ে লাল ডুরে শাড়ি পরা?

ক্ষণিকের আনন্দে নেচে উঠল রহিসউদ্দিনের মন। আল্লা তা হলে ডাক শুনেছেন। গায়ে একটু শক্তি অনুভব করতেই রহিসউদ্দিনের ভ্যান আবার পোঁ পোঁ করে ছুটতে শুরু করল।

বউ দুটো বোধহয় একটা রিকশা ভ্যানেরই অপেক্ষায় বাঁশ বাগানের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। একজনের কোলে একটা শিশু। ঘুমিয়ে আছে। রহিসউদ্দিন সামনে আসতেই বউ দুটো হাউমাউ করে এসে পড়ল তাঁর ওপর।

'ওগো মিনশে, ছেইলিডা আমার মই্রি ভূত হহি যাবে গো।

জলদি কইরি আলমডেঙ্গা আসপাতালে না গেলি এরে আমি কী যে করব। খুদা তুমার মঙ্গল করবে নে, যা ভাড়া চাও দেব নে, চলো। এই রাতির অন্ধকারই আর কুনু ভ্যান মিল্‌বি নানি জানি, তুমি চলো না মিন্‌শে! দয়া করো এই ছেই্‌লিডারে।'

রহিসউদ্দিন এ ধরনের পরিস্থিতি ঠিক আশা করেনি। তাই একটু ঘাবড়ে গেল প্রথমে। তারপরই এক হাত ঘোমটা দেওয়া বউটার কোলে প্রায় মরার মত শিশুটির দিকে তাকিয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, 'উই্‌ঠি পড়ো, উই্‌ঠি পড়ো। আমি জলদি ছুটাচ্ছি ভ্যান।'

বউ দুটো প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ভ্যানে। প্যাডেল ঘোরাতেই ফিরতে শুরু করল ভ্যানের গতি।

রহিসউদ্দিন ভ্যান চালাতে চালাতেই একবার জিজ্ঞেস করল, 'ও বউ, বাচ্চাডার কী হই্‌ছে?'

পেছন থেকে উত্তর এল, 'ডাইরিয়া।'

'বাচ্চাডা তুমার, না ওই বউডার?'

'আমার ছেই্‌লি গো। বানু তো আমার সই।'

'ও।'

আর কিছু জানার আগ্রহ প্রকাশ করল না রহিসউদ্দিন।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। প্রগাঢ় অন্ধকারে ছাওয়া বিরাটকায় বাঁশ বাগানটা নিরাপদেই পার হয়ে এল রহিসউদ্দিন। এখন সামনে পড়বে শুধু গোরস্থানটা।

এমন সময় শব্দটা এল।

কচ্‌, কচ্‌, কচ্‌, কচ...।

কেউ কিছু চিবাচ্ছে। ঢোক গিলে চোরা চোখে আশপাশে তাকাল রহিসউদ্দিন। কীসের শব্দ হয় অমন? উহ্‌ হু! ভক্‌ করে একটা অস্বাভাবিক গন্ধ এসে লাগল রহিসউদ্দিনের নাকে।

কোথাও কিছু পচল নাকি? যাবার পথে তো কোনও গন্ধ পায়নি।

কচ্, কচ্, কচ্, কচ্...।

শব্দটা জোরাল হলো। রহিসউদ্দিন পেছনের বউ দুটোকে উদ্দেশ করে জানতে চাইল, 'তুম্‌রা কুনু শব্দ শুন্‌তি পাও? কচ্ কচ্ শব্দ?'

উত্তর এল, 'না।'

নিস্তব্ধ, নিঝুম রাতের রোমহর্ষক সেই শব্দই শুধু ভেসে ভেসে আসতে লাগল রহিসউদ্দিনের কানে।

শরীর গুলিয়ে উঠল। এখনও গন্ধটা যায়নি। বরং তীব্র হয়েছে। হাত পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে রহিসউদ্দিনের। পেছনের বউগুলো কথা বলে না কেন? অল্প ঘুরে পেছনে কানটা খাড়া করল রহিসউদ্দিন। স্পষ্ট শুনতে পেল শব্দটা। থেমে পড়ল রিকশা ভ্যান। দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে রহিসউদ্দিনের। ঠাণ্ডা হিমেল একটা অনুভূতি মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেল তার।

কিছু একটা ঘটেছে পেছনে।

শব্দ আর গন্ধ দুটোই আসছে পেছন থেকে। রহিসউদ্দিন ভাবল– পেছন থেকে এমন গন্ধ আসবে কেন? কী হচ্ছে পেছনে? কচ্ কচ্ শব্দটা এখন হঠাৎ কচাক্ কচাক্ শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। তাকাবে কি একবার পেছনে? মেয়ে দুটোই বা করছে কী? হঠাৎ রহিসউদ্দিনের মনে হলো– বউ দুটো তার থেকে বয়সে ছোট। ভয় টয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেনি তো? এমুহূর্তে তাদের সাহস দেওয়া উচিত রহিসউদ্দিনের।

ধীরে ধীরে, একটু একটু করে ঘুরল রহিসউদ্দিন। প্রথমে অন্ধকারে ঘোলাটে লাগলেও ক্রমশ চোখ সয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার নেতিয়ে পড়া সব ক'টা চুল যেন আতঙ্কে দাঁড়িয়ে যেতে চাইল পেছনের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে।

বউটা জুলজুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিছুক্ষণ আগেই এ-ই কাকুতি-মিনতি করছিল রহিসউদ্দিনের কাছে। বউটার সমস্ত অবয়ব রক্তাক্ত। আধ হাত জিভ বের করে পরমতৃপ্তিতে চেটে নিচ্ছে মুখের চারপাশে লেগে থাকা রক্ত। আর অন্য বউটা সযত্নে কামড় বসাচ্ছে শিশুটির গলায়।

শিশুটার গলার নিম্নাংশ খেয়ে ফেলেছে বউগুলো। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সবকিছু। এসব কী উঠেছে ভ্যানে। এরা তো মানুষ নয়। নরমাংস খেকো ডাকিনী?

গন্ধ আসছে ওই রক্ত থেকে। কচাক্ কচাক্ শব্দটাও এখন বদলে গেছে। কট্ কট্ কট্ কট্।

হাড়! শিশুটার হাড় চিবাচ্ছে এক বউ।

নিমেষে একটা করুণ ভাবনা কাঁদিয়ে দিল রহিসউদ্দিনকে। আজই কী তার শেষ দিন? মাকে তা হলে কে খাওয়াবে?

আতংকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে যাচ্ছিল রহিসউদ্দিন। পারল না। টের পেল মাংসহীন খটখটে একটা হাত তার শ্বাসনালী চেপে ধরেছে। ফলার মত পাঁচটা ধারাল আঙুল গলা ফুঁড়ে ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। উত্তপ্ত রক্ত বেরিয়ে এল রহিসউদ্দিনের মুখ দিয়ে।

রক্ত!

ছটফটিয়ে উঠল রহিসউদ্দিন।

শ্বাস নেওয়ার জন্য বুকের ভেতর লাফালাফি করছে ফুসফুস।

হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে ভ্যানের সীট থেকে ছিটকে গিয়ে গোরস্থানের গেটের মুখে পড়ল রহিসউদ্দিন। আছড়ে পড়ে মেরুদণ্ডের হাড়টা ভেঙে গেল রহিসউদ্দিনের। একটু উঁচু হয়েই আবার কাত হয়ে মাটিতে পড়ল সে।

এমন সময় আরেকটা শব্দ ভেসে এল। ক্যাঁচ... কুচ... ক্যাঁচ... হড়... হড়।

বহু কষ্টে মাথা তুলল রহিসউদ্দিন।

একী! গোরস্থানের সেই জংধরা কালো বিভীষিকার মত গেটটা নিজে থেকেই হাঁ হয়ে খুলে যাচ্ছে। দরজা খোলার শব্দ ওটা। ক্যাঁচ... কুচ... ক্যাঁচ... হড় হড়...।

বউ দুটো তার চুলের মুঠি ধরে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে গোরস্থানের ভেতরে। হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে গাদা গাদা মাটি ঢুকে যাচ্ছে মুখে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল রহিসউদ্দিন। তারপরই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল গোরস্থানের গেট। ক্যাঁচ... কুচ... ক্যাঁচ... হড়... হড়...।

পরদিন সকালে গোরস্থানের সামনে দেখা গেল রহিসউদ্দিনের সেই চাপচাপ রক্ত মাখা ভ্যানটি। শুধু হারিয়ে গেল দু'জন মানুষ। একশো দুই বছর বয়সী কুদিয়া হাসুর একমাত্র ছেলে রহিসউদ্দিন ও বভবিল গ্রামের চেয়ারম্যান নবাব মোল্লার নাতি। মাত্র দু'মাস বয়স হয়েছিল তার।

সুস্ময় আচার্য সুমন

পিয়াসী

এক

সে রাতের সূচনাটা কীভাবে হয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করবার সাহস কিংবা সাধ্য– কোনওটাই আমার নেই। প্রিয়জন হারাবার কষ্ট ব্যাখ্যা করা যায়, বলুন? যতই শব্দের পিঠে শব্দ সাজিয়ে বলবার চেষ্টা করি না কেন। হৃদয়টা যে বারবার দুমড়ে-মুচড়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল– সে কথা কীভাবে খুলে বলব?

বড়পা মারা গিয়েছিলেন সেদিন আমার! আমার সরলরেখার মত সোজা, বৃষ্টির মত স্বচ্ছ বড় আপা।

এমন কিছু বয়স তাঁর হয়নি, একমাত্র ছেলেটা সবে ক্লাস ফাইভে। ক্যান্সার নামের বিশ্রী রকমের ঘাতক ব্যাধিটা বত্রিশ না পেরোতেই না জানি কোথায় নিয়ে গেল আমার আপাটাকে। বড় বেশি তাড়াতাড়ি! কত কথা যে বাকি ছিল বলবার!

না বলা হলো। না শোনা। শেষ দিনগুলোতে আপার মুখোমুখি পর্যন্ত হতাম না আমি। ভীষণ রকম জ্যান্ত মানুষটা শুকনো এক টুকরো মাংস পিণ্ডের মত বিছানায় পড়ে আছে, প্রতি মুহূর্তে আহ্বান করছে মৃত্যুকে– সে দৃশ্য সহ্য করবার মত শক্ত আমি নই। শুধু অসহায়ের মত ঘোরাফেরা করতাম কেবিনের

সামনে দিয়ে... পুরোটা দিন! ' কখনও আপার যন্ত্রণাকাতর আওয়াজ শুনতে পেলে দৌড়ে চলে যেতাম ক্যান্টিনের দিকে। একা একা বসে কাঁদতাম।

পুরুষ মানুষের নাকি কাঁদতে নেই!

কেন, বলুন তো? কাঁদব না তো কষ্টের ভার বইবার শক্তি কোথা থেকে আসবে? পুরুষ বলে তো আর পাষাণ নই!

আমার দিনগুলো ক্রমশ নরক যন্ত্রণার মত হয়ে উঠছিল। উদভ্রান্তের মত সারাদিন কেবিনের সামনে হাঁটাহাঁটি করি। আর রাতে আপার দিকে তাকিয়ে থাকি অতন্দ্র প্রহরীর মত। ঘুমন্ত আপার কোনও একটা নিঃশ্বাস একটু এলোমেলো হলেই আমার পঁচিশ বছরের তাজা হৃৎপিণ্ডটা বন্ধ হবার উপক্রম হয়। মনে হতে থাকে, আমি চোখ বুজলেই বুঝি আপার নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি তাই দুচোখের পাতা এক করিনি এতটুকু!

কিন্তু সেদিন রাতে ফাঁকি দেয়া হলো আমাকে। অতন্দ্র প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল সে। ঘুমের মাঝেই চলে গেল, ঠোঁটের কোণে হাসির ক্ষীণ রেখা নিয়ে। বিশ্বাস করুন, আমার চোখের ঠিক সামনেই অন্তিম নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করল আপা।

আমি দেখলাম। স্রেফ দেখলাম!

তন্ময়টা চিৎকার করে কাঁদছিল, দুলাভাইকে আঁকড়ে ধরে। শিহাব ভাইয়া, মেজ আপা, মা, বাবা! সবচাইতে নিঃশব্দ কান্না বাবার... কেবিনের এক কোণে দাঁড়িয়ে।

পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ... এর চাইতে ভারী বোঝা আর কী হতে পারে?

কোনও বাবার জন্যে এর চাইতে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে!!!

দুই

রাত কটা বাজে খেয়াল নেই। কতক্ষণ পার হয়েছে, তা-ও জানা নেই। চুপচাপ মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালের সিঁড়িতে বসে আছি আমি, একদম সদর দরজার সামনে। আমাকে পাশ কাটিয়ে না জানি কত শত লোক ঢুকছে; বের হচ্ছে! সময়ের অনুভব বলতে স্রেফ এটুকুই আমার অস্তিত্বে।

বড়'পার কথা এখন আর ভাবছি না। ভাবতে চাচ্ছি না। একটা মৃত্যুর পর না জানি কত শতেক রকম কাজ থাকে, সেসব করারও এতটুকু মানসিক শক্তি অবশিষ্ট নেই আমার মাঝে।

আমি শুধু বসে ছিলাম জড় পদার্থের মত। গেরুয়া রঙের চাদরটা ভালমত গায়ে জড়িয়ে। একের পর এক সিগারেট পোড়াচ্ছিলাম, যেন ধোঁয়ার সাথে উড়ে যাবে যাবতীয় কষ্ট।

আর হ্যাঁ, মাঝে মাঝে অবশ্য দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল মেয়েটার দিকেও। দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়িগুলোর এক কোণে, একটা পিলারকে আঁকড়ে ধরে। আমার ভীষণ অবাক লাগছিল এই ভেবে যে, মেয়েটার দিকে কারও দৃষ্টি কেন পড়ছে না? পুরুষের কথা বাদ দিলাম, কত নারী-ই পাশ কাটাচ্ছে তাকে। তাদের কারও কি একটু মমতা হচ্ছে না মেয়েটির জন্য?

ডিসেম্বরের কনকনে শীতের মাঝেও মেয়েটার শরীরে একটা গরম কাপড় নেই। গরম কাপড় দূরে থাক্, পরনে যা আছে তা-ও টেনে ছিঁড়ে দেয়া হয়েছে। সালোয়ার বলতে অবশিষ্ট আছে সামান্য একটু শতচ্ছিন্ন টুকরো, কোনওমতে ঝুলছে কোমর

থেকে। কামিজের হাতা বলতে কিছু নেই। স্রেফ একটু খালি কাপড় প্রাণপণে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে আছে বেচারী। মাথার চুলগুলো খাবলা খাবলা করে কেটে দেয়া। উন্মুক্ত পিঠে আর হাতে ফুটে আছে হিংস্র থাবার আঁচড়।

আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয় না। তাই গায়ের চাদরটা খুলে আলগোছে ঠেলে দেই তার দিকে। দীর্ঘশ্বাসে বুক এত ভারী হয়ে আসে যে মুখে কিছু বলতে পারি না।

আহারে বেচারী!

দুপুরে যার কথা শুনেছিলাম। সম্ভবত সেই মেয়েটাই। সামনের রাস্তার এক দোকান থেকে নাকি পাউরুটি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল।

হায়রে পুরুষ মানুষ!

চোর যদি পুরুষ হত, তা হলে দু/চার ঘা দিয়ে ছেড়ে দিত পাবলিক। কিন্তু মেয়ে বলে উন্মুক্ত রাস্তায় সহস্র হাত মিলে তার কাপড় খুলে নিয়েছে। সুযোগ বুঝে না জানি কতগুলো হাত খামচি দিয়েছে স্পর্শকাতর অঙ্গগুলোতে। বিনা পয়সার নগ্ন নারী-শরীর দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়েছে তাদের হায়েনা মন।

এদের মাঝে একটা হাতও কি পারত না মেয়েটিকে এক মুঠো খাবার দিতে? একটা হাতও কি চেষ্টা করতে পারত না মেয়েটার সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্য?

পারে যে নি, সে তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। এই ধরণীর বুক থেকে মায়া-মমতা নামের বস্তুগুলো কোথায় চলে গেছে?

এখনও তেমনি পড়ে আছে চাদরটা!

বেচারী হয়তো কল্পনাও করতে পারছে না যে, কোনও পুরুষ মানুষ মমতা দেখাচ্ছে তার প্রতি। একটু আগেই তো সহস্র পুরুষ হাত ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলেছে তাকে। কীভাবে হবে বিশ্বাস?' মেয়েটার

তো জানা নেই যে ওই হাতগুলো পুরুষের নয়, জানোয়ারের! কারণ সত্যিকারের পুরুষ বাহুর তো জন্ম নারীর সুরক্ষার জন্যে। অনিষ্টের জন্য নয়।

অনেক অনেকক্ষণ পর... আড়চোখে দেখি চাদরটা গায়ে জড়াল সে। মুখ দিয়ে আরাম সূচক একটা শব্দ করল।

এবার আর সংকোচ হয় না, সরাসরি তাকাতে পারি আমি। ক্ষীণ একটু হাসির ভঙ্গি করে অভয় দেবার চেষ্টা করি। তবে মেয়েটার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেরই প্রচণ্ড খারাপ লাগতে শুরু করে। চাপা একটা অস্বস্তি বিদ্যুৎ চমকের মত ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত দেহে।

মুখের প্রায় পুরোটাই চাদরের আড়ালে। তবু যেটুকুই বেরিয়ে আছে, সেটুকুর অবস্থা ভয়াবহ। বীভৎস ভাবে ফুলে আছে, কাটা ঠোঁটের রক্তে চিবুক মাখামাখি। একটা চোখ বুজে গেছে, অন্য চোখটা টকটকে লাল। যেন এক্ষুনি রক্ত ঝরতে শুরু করবে।

আমার দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকে সে। তারপর এক সময় করুণ সুরে বলে, 'তিয়াশ লাগছে গো, ভাইজান। তিয়াশ লাগছে!'

প্রথমে বুঝতে পারি না আমি। তখন আবার বলে, 'পানি চাইছিলাম। কেউ দেয় নাই। তিয়াশ লাগছে গো, ভাইজান!'

'তিয়াশ' মানে পিপাসা—এবার বুঝতে পারি আমি। মেয়েটাকে অপেক্ষা করতে বলে উঠে যাই। দেখি, ক্যান্টিনে ভাত-টাত এখনও আছে নাকি। পাওয়া গেলে পেট পুরে খাইয়ে দেব। সামান্য পাউরুটি চুরি করতে গিয়ে যে ধরা পড়েছে, তার নিশ্চয়ই সারাদিন খাওয়া হয়নি।

তখন আমার জানা ছিল না যে ফিরে গিয়ে আর মেয়েটার দেখা পাব না আমি!

তিন

কোথায় যেতে পারে?

মধ্যরাত্রি পার হয়েছে কয়েক মিনিট মাত্র। তবে এর মাঝেই সুনসান নীরবতা চারপাশে। হাসপাতালে অবশ্য রাত হয় দেরিতে। তবে মফস্বলের মেডিকেল কলেজ, আর কত?

চাদরটা পড়ে আছে সিঁড়িতে, নরম মাটিতে দেখা যাচ্ছে পায়ের ছাপ। হাসপাতালের পিছন দিকে গেছে।

একটু আগেই বৃষ্টি নেমেছে। শীতকালের বৃষ্টি, বুঝতেই পারেন! ঠাণ্ডায় আমার হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠছিল। তবুও চাদরটা তুলে নিয়ে পায়ের চিহ্নগুলো অনুসরণ করি আমি।

সত্যি কথা বলতে কী, অন্য সময় হলে হয়তো কখনোই একাজটা আমি করতাম না। তারওপর এমন ঘোর লোড শেডিং-এর মাঝে তো প্রশ্নই ওঠে না। কার মনে কী আছে বলা যায়? শেষে হয়তো আমাকে জড়িয়ে-টরিয়ে ধরে বলে বসবে যে রেপ করার চেষ্টা করছি।

শুনতে খারাপ শোনা যায়— তবে কথাটা সত্যি!

কিন্তু সেদিনকার ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এত মায়া লাগছিল মেয়েটার জন্যে! আর মস্তিষ্ক সেই মায়ার জাল বিস্তার করে প্রবল শোক থেকে রক্ষার চেষ্টা করছিল আমাকে।

পেছন দিকে তো মর্গ! ওখানে কী করতে গেছে মেয়েটা?

ভাবতে ভাবতে এগোই আমি। মাথার ভিতরে কী যেন একটা কুটকুট করে কামড়ে চলেছে। কিছু একটা মনে পড়ি পড়ি করেও

পড়ছে না। কী হতে পারে? বাবাকে কিছু বলার ছিল কি?

ঠাণ্ডায় অসহ্য লাগছে। একবার মনে হয় যে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিই। কিন্তু এমন কটু গন্ধ যে... কটু এবং ঝাঁঝাল!

এবং গন্ধটা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে!!

দূর থেকে মর্গের বিবর্ণ ভবনটুকু দেখতে পেয়ে পা জোড়া থমকে আসে আমার। আপনাআপনিই। গাঢ় অন্ধকারে চোখ কিছু ঠাহর করতে পারে না ঠিকই, তবে কান শুনতে পায় বিশ্রী শব্দটা।

চপাৎ! চপাৎ! চপাৎ!

যেন গোড়ালি পানিতে কেউ ইচ্ছা করে শব্দ তুলে হাঁটছে। যেন প্রকাণ্ড কোনও দৈত্য কিছু একটা চেটে চেটে খাচ্ছে। যেন...

শব্দটার কারণেই কিনা কে জানে, এক ঝটকায় কথাটা মনে পড়ে যায় আমার। মনের মাঝে কুটকুট করে কামড়ে চলা কথাটা...

এই মর্গের দারোয়ানই বলেছিল, দাঁতগুলো সব বের করে কুৎসিত ভাবে হাসতে হাসতে।

'হারামজাদী চোরনী! এক্কেরে থেঁতলায় ফেলছে, সার। ভাল হইছে, মরছে! খানকী কোথাকার!'

বাক্যগুলো মুহূর্তের মাঝে বরফের মত জমিয়ে ফেলে আমাকে। সেই মেয়েটার কথাই বলছিল দারোয়ান! পাউরুটি চোর মেয়েটার কথা!

হায় আল্লাহ! তাই যদি হবে, তা হলে সিঁড়ির গোড়ায় আমার সাথে কথা বলল কে? চাদরটাতে কার শরীরের কটু গন্ধ?... মাথাটা এলোমেলো হয়ে এল আমার! মেঘের গুড়গুড় আওয়াজ বুকের মাঝে আফ্রিকান ঢাকের আওয়াজ তুলতে শুরু করল।

ইচ্ছে করে ছুটে পালিয়ে যাই!

পা জোড়া কথা শোনে না।

ইচ্ছে হয় চিৎকার করে উঠি!

জিহ্বা সাড়া দেয় না।

দাঁড়িয়ে থাকি ঠায়, যেন একটুকরো পাথর আমি। এবং পরমুহূর্তেই বজ্রের ঝলকানিতে দৃশ্যটা স্পষ্ট হয় আমার দুচোখের সামনে। যেন সিনেমার কোনও দৃশ্য, আমি অন্ধকার হলে বসে দেখছি!

কী বলব!! যা দেখেছি, তা আদৌ ব্যাখ্যা করা সম্ভব কি না আমার জানা নেই। অন্তত আমার পক্ষে তো কিছুতেই সম্ভব নয়।

আমি স্পষ্ট দেখলাম মর্গের দারোয়ান লোকটা পড়ে আছে কাদা পানির মাঝে, সাদা শার্ট রক্তে রঞ্জিত। আর মেয়েটা... সেই মেয়েটা বিরাট মাকড়সার মত উবু হয়ে বসে আছে দারোয়ানের বুকের ওপর। লাশটার চিরে ফেলা বুক দুহাতে ফাঁক করে ভেতর থেকে চেটে চেটে খাচ্ছে রক্ত!

হাত খানেক লম্বা বিরাট লকলকে জিভ, কুচকুচে কালো। একটা জ্যান্ত প্রাণীর মত ক্রমাগত চেটেই চলেছে। চেটেই চলেছে...

আর শব্দ তুলছে... চপাৎ! চপাৎ! চপাৎ!

হয়তো চিৎকার করে উঠি আমি, কারণ বন্ধ হয় ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা। নারী শরীররূপী পিশাচটা মুখ তুলে তাকায় আমার দিকে। এত দূর থেকেও ধক ধক করে জ্বলতে থাকা দৃষ্টি পরিষ্কার দেখি আমি, কটু গন্ধে শিউরে উঠি।

'তিয়াশ লাগছে গো। ভাইজান! এমুন তিয়াশ লাগছে!'

এবার সজ্ঞানেই চিৎকার বের হয় আমার কণ্ঠ চিরে। এবং পরমুহূর্তেই নিজেকে কাদা পানির মাঝে আবিষ্কার করি। পড়ে গেছি চিৎ হয়ে... আর...

আর আমার বুকের ওপর উবু হয়ে বসে আছে প্রাণীটা। তার

থেঁতলে যাওয়া চেহারা থেকে তাজা রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে আমার চোখে, মুখে, ঠোঁটে!

'ডরান ক্যান গো, ভাইজান? আফনেরে তো খামু না! আপনি ভালা! ভালা মানুষ!'

মুখটা আরও কাছে আনে সে। ভক্ করে দুর্গন্ধ এসে অস্তিত্ব গুলিয়ে দেয়ার চাইতেও ভয়াবহ ব্যাপার হয়, যখন দেখি তার অক্ষি কোটর থেকে গলিত বাম চোখটা গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে...

'ডরাইয়েন না, ভাইজান! কী করমু, তিয়াশ লাগে যে!! এমুন তিয়াশ লাগছে!!'

চার

ডাক্তাররা বলেছিল নার্ভাস শক্!

অমন ঘোর অন্ধকার রাতে সদ্য একটা মানসিক আঘাত পাওয়া আমি মর্গের দারোয়ানের বীভৎস মৃতদেহটা দেখে আর সহ্য করতে পারিনি। উত্তপ্ত মস্তিষ্ক আমাকে রক্ষার জন্যই নাকি ওরকম অবাস্তব কাহিনি সাজিয়ে সংজ্ঞালুপ্ত করে দিয়েছে। নতুবা হয়তো শকে আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যেতে পারত!

কে জানে, হয়তো চিকিৎসকদের কথাই সত্যি!

দারোয়ানের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে বিস্তর থানা-পুলিশ হয়েছিল। তবে কোনও লাভ হয়নি। ধরা পড়েনি খুনি।

কিন্তু ঘটনা যাই হোক না কেন, একটা কাজ আমি ঠিকই করেছিলাম। পরিবারের প্রবল আপত্তির মুখেও।

অনেক ঝামেলা-টামেলা করে মর্গের লাওয়ারিশ লাশের

কাতার থেকে খুঁজে বের করেছিলাম মেয়েটার লাশ। এবং তাকে সমাহিত করার ব্যবস্থা করেছিলাম। জানতে পারিনি সে কোন ধর্মের মানুষ, অগত্যা ইসলাম ধর্মের নিয়ম মেনেই!... আমার যতটুকুন সাধ্য ছিল!

সম্মানের মৃত্যু মেয়েটি পায়নি। আমি তাই সামান্য একটু চেষ্টা করেছিলাম মৃত্যুর পর তাকে খানিকটা সম্মান দিতে।

আমার চেষ্টাটুকু কি তার কাছে পৌঁছেছিল?

হয়তো হ্যাঁ।

হয়তো বা না।

কে জানে!

পরিশিষ্ট

হাসতে হাসতে হাসপাতালের সিঁড়িতে পা রাখেন জামান সাহেব। অনেক দিন পর উত্তেজনাকর একটা কিছু দেখা গেছে। বারো মাসের অসুখে বউ পনেরো দিন হলো হাসপাতালে, মেজাজটা এত খারাপ লাগছিল!

বাজারের কাছে চোর ধরা পড়েছিল আজকে, সন্ধ্যার একটু পরপর। এমন ডলা দেয়া হয়েছে হারামজাদাকে! কীসের পুলিশ, কীসের কী! মাইর না দিলে এই সব হারামজাদারা সোজা হয় না।

একদম জবরদস্ত কন্ডিশন!

মনে করে হাসির একটা ক্ষীণ রেখা ঢেউ তুলে যায় জামান সাহেবের মুখে। নিজেও লাগিয়েছেন দু-চার ঘা। অনেক দিন পর হাতের সুখ মিটিয়ে পিটিয়েছেন...

হাসপাতালে আর ঢোকা হয় না, মেয়েটা দৃষ্টি কাড়ে। এত রাত হয়েছে, বেটি এখানে কী করে? বেশ্যা মনে হয়...

অবশ্য শরীর বটে একখান। গায়ে খালি একটা চাদর জড়ানো। সেটাকে ছাপিয়ে উপচে উঠছে শরীরের আঁক-বাঁক কাস্টমার ধরার ভালোই কৌশল!

লোভীর মত ঠোঁট চাটেন জামান সাহেব। বেটি বেশ্যা না হলেই বা কী? চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে পেটে খিদে। কাজের পর বিশটা টাকা ধরিয়ে দিলে নাচতে নাচতে চলে যাবে! তবে তাকে পা বাড়াতে হয় না। মেয়েটাই এগিয়ে আসে।

'তিয়াশ লাগছে, চাচাজান! বেজায় তিয়াশ লাগছে!'

মেয়েটার হাত ধরে হাসপাতালের পেছন দিকে নেবার সময় জামান সাহেবের ধারণাও ছিল না যে...

আজকের রাতটা তাঁর জীবনের সর্বশেষ অধ্যায় হতে চলেছে।

রুমানা বৈশাখী

স্বপ্নপিশাচ

এক

সাইকিয়াট্রিস্ট ড. আসগর আলীম সবকিছুই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই মানুষটিকেও তিনি খুব আগ্রহের সাথে দেখছেন। এটি তাঁর চিকিৎসার একটি নিজস্ব পদ্ধতি। রোগীর বাইরের দিকটা দেখেই তিনি রোগীর মানসিক অবস্থাটা আঁচ করতে চেষ্টা করেন।

তাঁর সামনে দণ্ডায়মান ভদ্রলোকটির বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নর বেশি হবে না। দাঁড়িয়ে আছেন অনেকটা জবুথুবু হয়ে এবং তিনি কাঁপছেন। মাথার কাঁচাপাকা চুল উস্কোখুস্কো। গালে কয়েকদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ের খয়েরি চেক শার্টটি বোধহয় মাসখানেক ধরে পরে আছেন। সেটির রং চটে গেছে এবং কোঁচকানো। পরনের প্যান্টটিরও একই অবস্থা। ভগ্নস্বাস্থ্য। পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল, যা কিনা শার্ট প্যান্টের সাথে অত্যন্ত বেমানান। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোক নিজের দিকে নজর দেয়ার সময় একদম পাচ্ছেন না।

ভদ্রলোকের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো তাঁর চোখ। মনে হচ্ছে কেউ তাঁর দু'চোখের নীচে এক

পোঁচ করে কালি মেখে দিয়েছে। কোটরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া চোখ দুটি অত্যন্ত অস্থির। মানসিক অসুস্থতার স্পষ্ট লক্ষণ। ড. আসগর আলীম তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারলেন, ভদ্রলোক মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু একটা তাঁকে ক্রমাগত তাড়া করে ফিরছে। যেন সর্বনাশা কিছু একটা ঘটে যাবার আশংকায় তিনি আতংকিত। ড. আসগর আলীম আরও লক্ষ করলেন ভদ্রলোক ব্যক্তি জীবনে নিঃসঙ্গ একজন মানুষ। কারণ মানসিকভাবে অসুস্থ একজন মানুষ সাধারণত একা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে আসে না। পরিচিত কেউ নিয়ে আসে।

এই ভদ্রলোকই আজ ড. আসগর আলীমের প্রথম রোগী। এবং সম্ভবত একমাত্র। এই দুর্যোগের রাতে অবশ্য রোগী না আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমন দুর্যোগ তিনি বহুকাল দেখেননি। বাইরে শোঁ-শোঁ বাতাস এবং ঝুম বৃষ্টি। সেই সাথে মেঘের গুম্ গুম্ এবং পিলে চমকানো শব্দে বজ্রপাত। ড. আসগর আলীম স্মিত হেসে বললেন, 'আসুন, বসুন, প্লিজ। আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। শান্ত হয়ে বসুন। আপনার মত মানুষের সেবা করাই আমার পেশা। সুতরাং ভয় পাবেন না।'

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে চেয়ারে বসলেন, কাঁপছেন এখনও। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছেন তিনি। ড. আসগর আলীমের অভিজ্ঞ দৃষ্টি তাঁকে বলে দিল, ভদ্রলোকের কাঁপুনির উৎস আজকের শীতল আবহাওয়া নয়, তাঁর কাঁপুনির যে উৎস, তার নাম আতংক। তিনি ভদ্রলোকের দিকে তোয়ালেটা এগিয়ে দিলেন। আন্তরিক কণ্ঠে বললেন, 'খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, না? চা খাওয়া যাক, কী বলেন?'

মাথা মুছে ভদ্রলোক নিশ্চুপ বসে রইলেন। কিছু বললেন না। ড. আসগর আলীম ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে এগিয়ে দিলেন। ভদ্রলোককে ধাতস্থ হবার সময় দিতে হবে। চুপচাপ চায়ের কাপ

টেনে নিলেন ভদ্রলোক। আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগলেন।

চা শেষ করে তিনি অস্থিরভাবে শার্টের এবং প্যান্টের পকেট হাতড়াতে লাগলেন। যেন খুব জঁরুরী কিছু খুঁজছেন। ড. আসগর আলীম ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি ভদ্রলোকের দিকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

অস্ফুট স্বরে এই প্রথম কথা বললেন ভদ্রলোক, 'রকিবুল হোসেন।'

'রকিবুল হোসেন সাহেব, আপনার সমস্যার কথা বলুন। ধীরেসুস্থে বলুন, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ওই যে বললাম, আপনার মত মানুষকে নিয়েই আমার কাজ। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্তে শুরু করুন।'

কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেট ধরালেন রকিবুল হোসেন। সুদীর্ঘ টান দিলেন সিগারেটে। ধোঁয়াটা অনেকক্ষণ ফুসফুসে চেপে রাখলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে ছাড়তে লাগলেন। এবার খানিকটা ধাতস্থ মনে হচ্ছে তাঁকে। কাঁপুনিও বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, 'একটা স্বপ্ন...' বলেই চুপ করে গেলেন।

'হ্যাঁ, বলুন।' বললেন ড. আসগর আলীম। রকিবুল হোসেন নিশ্চুপ।

'দেখুন,' ড. আসগর আলীম স্থির কণ্ঠে বললেন, 'আপনি যদি সমস্যাটা ভেঙে না বলেন, তা হলে আমার পক্ষে আপনার জন্য কিছুই করা সম্ভব হবে না।'

রকিবুল হোসেন সামান্য মাথা ঝোঁকালেন। পরপর কয়েকটা টান দিলেন সিগারেটে। তারপর শুরু করলেন তাঁর জীবনের ভয়াবহতম অভিজ্ঞতার কথা।

বাইরে তখন দুর্যোগটা আরও বেড়েছে।

দুই

'স্বপ্ন দেখাটা আমার ছিল একটা মুদ্রাদোষের মত।

'প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও স্বপ্ন দেখতাম। উদ্ভট, আজগুবি সব স্বপ্ন। যার সাথে বাস্তবতার বিন্দুমাত্র মিল নেই। তখন আমার বয়স আঠারো। বত্রিশ বছর আগের কথা। আমি একটা স্বপ্ন দেখি।

'সেটাও ছিল এরকম এক দুর্যোগের রাত। এই স্বপ্ন ছিল আমার নিত্য দেখা স্বপ্নগুলো থেকে একেবারেই আলাদা। এত স্পষ্ট সেই স্বপ্ন! এত জীবন্ত! গন্ধ, বর্ণ, সবই আমি অনুভব করেছিলাম সেই স্বপ্নে। আমার জীবনের ভয়াবহতম দুঃস্বপ্ন ছিল সেটা।

'আমি নিজেকে একটা অপরিচিত বাড়িতে দেখলাম। নিশুতি রাত। শীতকাল। গা শিউরানো সেই সুতীব্র ঠাণ্ডাও আমি স্পষ্ট অনুভব করেছি। দেখলাম, অচেনা বাড়িটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। অজপাড়া গাঁয়ের একটি বাড়ি। টিনের চাল, বাঁশের বেড়া। আমার এক পা মাটির তৈরি সিঁড়িতে। সিঁড়ি থেকে নামলেই মাঝারি সাইজের একটি ঝকঝকে উঠোন। গাছপালা দিয়ে ঠাসা একটি বাড়ি। উঠোনের ডানপাশে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটা চোখে পড়ে সবচেয়ে বেশি। আমি উঠোনে নামার উপক্রম করলাম।

'তখনি একটা শব্দ শুনলাম। অনেকটা কবুতরের ডানা ঝাপটানোর মত শব্দ। ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আমি কৌতূহলী

চোখে তাকিয়ে আছি কোনও নিশাচর পাখি দেখার জন্য। অবশেষে সেই শব্দের উৎস চোখে পড়ল আমার। আমি দেখলাম একটা পিশাচ। উড়ে আসছে!'

'এক মিনিট,' ড. আসগর আলীম থামিয়ে দিলেন রকিবুল হোসেনকে, 'আপনি কী করে শিওর হচ্ছেন যে সেটা পিশাচ ছিল? আপনি কি কখনও পিশাচ দেখেছেন?'

রকিবুল হোসেন প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট টেনে নিলেন, 'ডক্টর, আপনি যদি ওটাকে দেখতেন, তবে একবাক্যে স্বীকার করতেন যে সেটা পিশাচ। অন্য কোনও বিশেষণে তাকে অভিহিত করা সম্ভব নয়।'

'তারপর বলুন।'

'পিশাচটা উড়ে এসে বসল তেঁতুল গাছটার একটা মোটা ডালে। ওর চেহারা এখনও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। সমস্ত শরীর ছাই রঙের। ঢালু কপাল। ডানা দুটো ধবধবে সাদা, আকৃতিতে অনেকটা বাদুড়ের ডানার মত। দু'চোখের জায়গায় যেন দু'টুকরো তেকোনা রেডিয়াম বসিয়ে দেয়া হয়েছে। বাঁকানো মোটা ভ্রু। বাজ পাখির ঠোঁটের মত নাক। নীচের ঠোঁট এতটাই ঝুলে পড়েছে যে থুতনি ঢেকে গেছে। লোলুপ সে ঠোঁট বেয়ে লালা ঝরছে। ধনুকের মত পিঠ। সারা শরীর বানরের মত লোমে ঢাকা। খাটো পায়ে এবং অস্বাভাবিক লম্বা হাতে দীর্ঘ ছুঁচালো নখ। ঠিক বাজ পাখির মতই সে গাছের ডালটাকে পা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে। তার হাতে পাঁজাকোলা করা একটা লাশ। সম্ভবত কোনও কবর থেকে তুলে এনেছে। সদ্য পচন ধরা মাংসের নাড়ি উল্টে আসা গন্ধ আমি পেয়েছি। সে গন্ধ লাশের নাকি ওই পিশাচের শরীরের তা বলতে পারব না।

'লাশটা একপাশে নামিয়ে রাখল পিশাচটা। তারপর ঘাড়

কাত করে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তার তাকানো দেখলে পেঁচার কথা মনে পড়ে যায়। ডক্টর, সেই তাকানোর ভঙ্গি দেখে আমার হৃৎপিণ্ড লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে এল।

'পিশাচটা আমার দিকে তাকাল সরাসরি। আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন গলা থেকে এবার উঠে এল আলজিহ্বায়। কোনও রকমে একটা ঢোক গিলে সেটাকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিতে পারলাম।

'কিন্তু আমাকে দেখে পিশাচটার চোখে মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। সে নির্বিকার ভাবে লাশটাকে তুলে নিল। কাফন সরিয়ে কচাক্ করে কামড় দিয়ে একখাবলা মাংস তুলে নিল। চিবোতে লাগল সশব্দে। প্রায় গলা পর্যন্ত উঠে আসা বমি প্রাণান্ত চেষ্টায় ঠেকালাম আমি। পিশাচ্টা লাশের মাথা একটান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল গাছের তলায়। লাশটাকে আবার কাপড় দিয়ে ঢেকে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল পিশাচ্টা।

'আমি তখনও সিঁড়িতে এক পা দিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছি। একটু ধাতস্থ হয়ে অবাধ্য পা দুটোকে টানতে টানতে এগিয়ে গেলাম গাছের নীচে। তৃতীয়ার চাঁদ আকাশে। তার আলোয় স্পষ্ট দেখলাম রক্তে মাখামাখি হয়ে থাকা মাথাটা আমার বাবার।

'অপার্থিব এক আতংক নিয়ে চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম আমি। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে জব্জব্ করছে। বুকের মধ্যে যেন দুরমুশ পিটছে কেউ। এক জগ পানি খেয়েও তৃষ্ণা মেটাতে পারিনি। পরদিন আমার বাবা স্ট্রোক করে মারা যান।'

রকিবুল হোসেন থামলেন। শার্টের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। ড. আসগর আলীম বললেন, 'রকিবুল হোসেন সাহেব, [illegible]ন যে অতিপ্রাকৃত ঘটনার কথা বললেন, তার ব্যাখ্যা অত্যন্ত সহজ নয় কী?'

'জ্বী, সহজ। কাকতালীয় ঘটনা। কো ইন্সিডেন্স।'

'ঠিক তাই। কিন্তু আমার ধারণা, ঠিক এই কারণে আপনি আমার কাছে আসেননি। বত্রিশ বছর আগে একটি কাকতালীয় ঘটনা নিয়ে কোনও বুদ্ধিমান মানুষই বিচলিত হবে না

'আপনি ঠিকই ধরেছেন।' অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, রকিবুল হোসেন, 'ঘটনার শেষ এখানে নয়। সম্প্রতি আমার জীবনটাকে একটা মূর্তিমান বিভীষিকায় পরিণত করেছে এই স্বপ্ন। প্রকৃত সমস্যাটা সেখানেই।'

'বলুন, আপনার প্রকৃত সমস্যার কথা।'

'ডক্টর, আরেক কাপ চা কি পেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' ড. আসগর আলীম চা ঢেলে এগিয়ে দিলেন।

চা শেষ করে রকিবুল হোসেন সিগারেট নিলেন। প্রচণ্ড বজ্রপাতে বৈদ্যুতিক ট্র্যান্সফরমার ফাটল কোথাও। তিনি শুরু করলেন।

তিন

'এই ঘটনার বছর দশেক পর আমি বিয়ে করি। আমার স্ত্রী চোদ্দগ্রামের মেয়ে।

'সেবার বিয়ের পর প্রথম শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছি অজপাড়াগাঁ। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বাথরুমে যেতে হবে। আমার স্ত্রী অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি উঠলাম। নতুন জামাই হওয়াতে লজ্জাবশত সামনের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে পেছন দিক দিয়ে বেরনোই স্থির করলাম।

'দরজা খুলে সিঁড়িতে এক পা দেয়া মাত্র আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। বাড়ির পেছনের দৃশ্যগুলো আমার খুব পরিচিত মনে হলো। মনে হলো আমি এখানে আগেও এসেছি। পর মুহূর্তে দশ বছর আগে দেখা সেই স্বপ্নটা মনে পড়ে গেল। আমি হতভম্ব হয়ে আবিষ্কার করলাম আমার জীবনের ভয়াবহতম দুঃস্বপ্নের সেই বাড়িটিতে ঠিক একই ভঙ্গিতে আমি দাঁড়িয়ে আছি। সেই মাটির সিঁড়ি, ঝকঝকে উঠোন, ঘন গাছপালা, সেই ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ। আর কী আশ্চর্য! সেদিনও আকাশে তৃতীয়ার চাঁদ! প্রচণ্ড আতংকে আমি জমে গেলাম। স্থবির হয়ে গেল যেন সময়।

'হঠাৎ সেই ডানা ঝাপটানোর শব্দ। সেই শব্দ যতই এগিয়ে আসতে লাগল, তার সাথে পাল্লা দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ডটাও বুকের খাঁচায় সজোরে বাড়ি দিতে লাগল। একটু বাদেই আমি পিশাচটাকে দেখতে পেলাম। অবিকল স্বপ্নের সেই বীভৎস চেহারা। তারপর ডক্টর, আমি আমার স্বপ্নটাকে বাস্তবে হুবহু দেখতে পেলাম। স্বপ্নের মাঝেই যেন প্রত্যেকটি ঘটনা পরপর ঘটে গেল। পিশাচটা আমাকে দেখল নির্বিকার চোখে। কামড় দিয়ে এক খাবলা মাংস খেল হাতে ধরা লাশের শরীর থেকে। নাড়ি ওল্টানো লাশ পচা গন্ধ ধাক্কা দিল আমার নাকে। লাশের মাথাটা ছিঁড়ে গাছের নীচে ফেলে উড়ে চলে গেল আমার স্বপ্নপিশাচ! আমি গাছের নীচে এগিয়ে গেলাম বোধশক্তিহীন জম্বির মত। রক্তমাখা একটা মাথা খুঁজে পেলাম এবং সেটা আমার স্ত্রীর!

'আমি উন্মাদের মত ছুটে এলাম ঘরে। আমার স্ত্রী আগের মতই ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে, নাকি সে মৃত! আমি আমার কম্পমান হাত তার নাকের কাছে ধরলাম। ঘুমন্ত মানুষের স্বাভাবিক উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার হাতে লাগল। আমি শুয়ে পড়লাম। হাঁপরের মত ওঠানামা করছে বুক।

'পরদিন ভরদুপুরে আমার স্ত্রীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। শোবার ঘরে কড়িকাঠের সাথে ঝোলানো ছিল। আত্মহত্যা। তার রেখে যাওয়া চিঠি থেকে জানতে পারি, বিয়ের আগে গ্রামের একটি ছেলের সাথে তার প্রণয় ছিল। আমার সাথে সে নাকি সুখী ছিল না। অথচ সে না আমাকে কিছু বলেছে, না তার আচরণে কিছু প্রকাশ পেয়েছে। তখনি ডক্টর আমার মনে হলো, পিশাচটা বোধহয় প্রত্যেক দর্শনেই আমাকে কারও না কারও মৃত্যুর পরোয়ানা দিয়ে যায়।'

রকিবুল হোসেনের কথা শেষ হওয়া মাত্র বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন হলো, 'আপনার স্ত্রীর মাথাটা কী করলেন?'

'জ্বী' গম্ভীর ঘোরের মধ্য থেকে যেন চমকে বাস্তবে ফিরলেন রকিবুল হোসেন।'

'জ্বী। আপনার জীবনে পিশাচটার দ্বিতীয় আগমনটা স্বপ্ন ছিল না, ছিল বাস্তব।' বললেন ড. আসগর আলীম। 'তা হলে আপনার স্ত্রীর মাথাটা যখন আপনি গাছতলায় খুঁজে পেলেন, সেটাও নিশ্চয়ই বাস্তব। তবুও আপনার স্ত্রীর মাথাটা আপনি আর খুঁজে পাননি, তাই না? গেল কোথায় মাথাটা?'

রকিবুল হোসেন মাথা নিচু করে বললেন, 'এভাবে কখনও ভেবে দেখিনি তো।'

'আপনার বত্রিশ বছর আগের কাকতালীয় ঘটনার মত এই ঘটনার ব্যাখ্যাও খুব সহজ।' ড. আসগর আলীম আরাম করে তাঁর গদিমোড়া চেয়ারটায় হেলান দিলেন, 'রকিবুল হোসেন সাহেব, মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনুন। আঠারো বছর বয়সে আপনি একটি দুঃস্বপ্ন দেখলেন। যে স্বপ্ন আপনার মনে গভীর রেখাপাত করল। ঘটে গেল একটি কাকতালীয় ঘটনা। আপনার মস্তিষ্ক তার অগণিত কোষের কোনও একটিতে এই দুঃস্বপ্নের

স্মৃতিকে সযত্নে সংরক্ষণ করল। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ বাড়িই গাছপালায় ঠাসা থাকে এবং তেঁতুল খুব কমন একটি গাছের নাম। আপনার শ্বশুর বাড়িও সেরকমই একটি বাড়ি। গভীর রাতে আপনি যখন সিঁড়িতে পা দিলেন, আপনার এক ধরনের ইলিউশন হলো। আপনার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়ে উঠল। একটি মোক্ষম অজুহাত পেয়ে সে পুরনো স্মৃতিকে উগরে দিল। আর ঠিক তখনি একটা হ্যালুসিনেশন হলো। আপনার উত্তপ্ত মস্তিস্ক একটি স্বপ্নদৃশ্যকে আপনার সামনে হাজির করল। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন?

রকিবুল হোসেন রোবটের মত বললেন, 'জ্বী।'

'আপনার অসুখটির নাম সিজোফ্রেনিয়া। মানসিক রোগের মধ্যে এটি খুব কমন এবং ভয়াবহ একটি রোগ। তবে আপনি বোধহয় সিজোফ্রেনিয়ার প্রারম্ভিক পর্যায়ে আছেন। কারণ আপনার যুক্তিবোধ নষ্ট হয়নি। এ রোগে আক্রান্তরা মনে করে তাদের জীবনে একই ঘটনা বারবার ঘটছে। কাউকে দেখে ভাবে একে সে আগেও কোথাও দেখেছেন। তার স্থির বিশ্বাস জন্মে যায় যে তার মধ্যে কোনও সুপার পাওয়ার চলে এসেছে। বুঝতে পারছেন?'

'জ্বী বুঝতে পারছি।'

'আমি আপনাকে কিছু ওষুধ লিখে দিচ্ছি।' ড. আসগর আলীম প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্‌ বুক টেনে নিলেন, 'এর মধ্যে ঘুমের ওষুধও আছে। মানুষ স্বপ্ন দেখে হালকা ঘুমে। ঘুম গভীর হলেই আর স্বপ্নটা দেখবেন না। একমাস পর দেখা করবেন। অবস্থার উন্নতি না হলে সাইকোথেরাপির প্রয়োজন হতে পারে। আরেকটি কথা, রকিবুল হোসেন সাহেব, একই কাকতালীয় ঘটনা একজন মানুষের জীবনে একাধিক বার ঘটতে পারে। এরকম অনেক রেকর্ড আছে।'

'ডক্টর,' রকিবুল হোসেনের কণ্ঠ কেমন যেন অপার্থিব শোনাল, 'এত বছর আগের ব্যাপার নিয়ে আজ আমি আপনার কাছে আসিনি। ঘটনা সেখানে শেষ হয়নি। প্রকৃত ব্যাপারটা আরও ভয়াবহ।'

ড. আসগর আলীম লেখা থামিয়ে রকিবুল হোসেনের দিকে তাকালেন, 'বলুন।'

'ডক্টর, আমার স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় বাইশ বছর পর হুবহু একই স্বপ্ন আমি মাস তিনেক আগে আবার দেখি। পিশাচটা যথারীতি লাশের মাথাটা ফেলে দিয়ে যায় এবং আমি গাছের তলায় একটি অপরিচিত মুখ কুড়িয়ে পাই। পরদিন খবরের কাগজে সেই মানুষটির নৃশংসভাবে খুন হবার সংবাদ ছবিসহ ছাপা হয়। এরপর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত তিন চার দিন এই ঘটনা ঘটে চলেছে। স্বপ্নে পিশাচটার ফেলে যাওয়া মাথাটা আমি পরদিন কোথাও না কোথাও দেখতে পাই। কারণ আমার স্বপ্নের প্রতিটি মানুষেরই মৃত্যু হয় অপঘাতে।'

'কিন্তু, রকিবুল হোসেন সাহেব, অপঘাতে মৃত্যুর সব খবরই পত্রিকায় আসে না।'

'তখন আমার কাছে চিঠি আসে।'

'চিঠি!'

'হ্যাঁ। আমার লেটার বক্সে আমি একটা চিঠি পাই। সেই চিঠিতে নাম ঠিকানা কিছুই থাকে না। অজ্ঞাতনামা প্রেরক অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমাকে অবহিত করেন স্বপ্নে দেখা ব্যক্তিটির মৃত্যু সম্পর্কে। এখন প্রতিরাতে আমি ভয়াবহ আতংক নিয়ে অপেক্ষা করি কবে আমি গাছতলা থেকে আমার নিজের মাথাটা কুড়িয়ে আনব।'

ড. আসগর আলীম কিছুক্ষণ রকিবুল হোসেনের দিকে

নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ স্মিত হেসে বললেন, 'দেখুন, রকিবুল হোসেন সাহেব, আপনি একজন সিজোফ্রেনিয়াক। আগেই বলেছি এ ধরনের রোগীরা মনে করে তাদের মধ্যে কোনও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা এসে গেছে আপনার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে পিশাচটা আপনাকে মৃত্যুর আগাম খবর দিয়ে যায়। আপনি নিশ্চয়ই একা থাকেন, তাই না?'

'জ্বী। স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর বিয়ে করিনি।'

'আপনার স্ত্রীর আত্মহত্যা এবং বাবার মৃত্যু, আপনার জীবনের বৃহত্তম দুটি দুর্ঘটনার সাথে জড়িয়ে আছে আপনার স্বপ্নপিশাচ। এই পিশাচই হয়ে উঠেছে আপনার নিঃসঙ্গ জীবনের বিভীষিকাময় সঙ্গী। ধীরে ধীরে আপনি আক্রান্ত হয়েছেন সিজোফ্রেনিয়ায়। আপনি পত্রিকায় একটি অপঘাতে মৃত্যুর সংবাদ দেখছেন এবং ধরে নিচ্ছেন একেই আপনি স্বপ্নে দেখেছেন। আসলে আপনার এ ধারণা ভুল। এটি সিজোফ্রেনিয়ার একটি উপসর্গ মাত্র। আমি কি আপনাকে বোঝাতে পারছি?'

'জ্বী। কিন্তু ওই চিঠি!'

'অজ্ঞাতনামা প্রেরকের কোনও চিঠি কি আপনার কাছে আছে?'

'জ্বী না। পড়ার পরপরই চিঠিগুলো আমি ছিঁড়ে ফেলে দেই।'

'কেন?'

'আমার তখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, ডক্টর।'

'কারণটা আমিই বলছি।' সিগারেটে লম্বা টান দিলেন ড. আসগর আলীম, 'চিঠিগুলো আপনারই লেখা।'

'জ্বী!' রকিবুল হোসেন স্তম্ভিত হয়ে বললেন।

'হ্যাঁ, রকিবুল হোসেন সাহেব। সিজোফ্রেনিয়াকরা নিজেই তাদের প্রত্যাশা অনুয়ায়ী একটা ঘটনা ঘটায় এবং মনে মনে ভেবে

নেয় ঘটনাটা অন্য কেউ ঘটাচ্ছে অথবা আপনাআপনি ঘটছে। আপনি ওই চিঠি লিখেছেন এবং নিজের লেটার বক্সে ফেলেছেন। আপনি সেটা বুঝতে পারবেন না। কারণ আপনি মেন্টালি ডিজঅর্ডার। কিন্তু আপনার অবচেতন মন ঠিকই সব জানে। সে আপনাকে বাধ্য করেছে চিঠি ছিঁড়ে ফেলতে। সে কোনও প্রমাণ রাখতে চাচ্ছে না যে কাজটা আপনারই।'

রকিবুল হোসেন কোন কথা বলছেন না। স্ট্যাচুর মত মাথা নিচু করে নিশ্চুপ বসে আছেন। তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। ড. আসগর আলীম বললেন, 'আরেকটু চিন্তা করুন। আপনাকে মৃত্যুর পূর্বাভাস দিয়ে কার কী লাভ? আপনি তো কাউকে খুন করছেন না। কিংবা আগে থেকে জেনে আপনি দুর্ঘটনা ঠেকাতেও পারছেন না। সুতরাং আপনার ধারণা পুরোপুরি অযৌক্তিক। আমার ব্যাখ্যা কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?'

'জ্বী, আপনার ব্যাখ্যা খুবই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু, ডক্টর...'

'বলুন।'

'আমি সিজোফ্রেনিয়াক নই।'

ঝড়ো বাতাসে জানালার কাঁচ ভাঙল কোথাও।

চার

'মানে?' ড. আসগর আলীম যুগপৎ বিস্মিত এবং বিরক্ত হলেন। এই পাগল বলে কী! সাইকিয়াট্রিস্ট কি তিনি না এই পাগলটা! তিনি কণ্ঠস্বর সংযত রেখে বললেন, 'দেখুন, আপনার সাথে কেউ আসেনি তাই আপনাকেই সব বলতে হচ্ছে। মানসিকভাবে অসুস্থ

একজন মানুষ কখনোই নিজেকে...' থমকে গেলেন ড. আসগর আলীম।

রকিবুল হোসেনের মুখভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বিস্ফোরিত চোখ দুটি যেন কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কপালে এবং সমস্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। ভারী হয়ে উঠেছে নিঃশ্বাস। হাঁপানির রোগীর মত সশব্দে টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছেন তিনি। থরথর করে কাঁপছেন মৃগীরোগীর মত।

'রকিবুল হোসেন সাহেব,' বিরক্ত কণ্ঠে বললেন ড. আসগর আলীম, 'কী হয়েছে আপনার? আপনার স্বপ্নপিশাচ কি এই চেম্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে?'

'ডক্টর, ওই ছবিটা কার? ফ্রেমে বাঁধানো?'

রকিবুল হোসেনের আতংকিত দৃষ্টি অনুসরণ করে ছোট ডেস্কটার দিকে তাকালেন ড. আসগর আলীম। তিনি বিরক্তির প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছেন, 'ওটা আমার ছোট মেয়ের ছবি। নাম সানজানা। কেন, রকিবুল হোসেন সাহেব, আমার মেয়ের চেহারার সাথে আপনার পিশাচের মিল খুঁজছেন নাকি?'

রকিবুল হোসেন কঠিন মুখে বললেন, 'তার চেয়েও ভয়াবহ। গত রাতে পিশাচটা যে মাথাটা গাছের নীচে ফেলে গিয়েছিল সেটি আপনার মেয়ের।'

'কী!'

'হ্যাঁ, ডক্টর। আমি স্বপ্ন দেখার ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুর সংবাদ আসে। ছত্রিশ ঘণ্টা হতে আর সাত মিনিট বাকি।' রকিবুল হোসেন দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন।

'রকিবুল হোসেন সাহেব,' ড. আসগর আলীম বললেন, 'আপনি কি আজ কোনও মৃত্যু সংবাদ পেয়েছেন?'

'জ্বী না।'

'সুতরাং আমার মেয়ের ছবি দেখে আপনি ধরে নিচ্ছেন তাকেই আপনি স্বপ্নে দেখেছেন। আপনি বসবাস করছেন একটি কল্পিত জগতে যা আপনারই সৃষ্টি। এক ধরনের ভয়াবহ ইলিউশনের মধ্যে আছেন আপনি, যা কিনা মানসিক অসুস্থতার স্পষ্ট লক্ষণ।'

রকিবুল হোসেন চুপ করে আছেন। ড. আসগর আলীম তাঁর দিকে আরেকটি সিগারেট এগিয়ে দিলেন, 'শুনুন রকিবুল হোসেন সাহেব, আপনি একজন সিজোফ্রেনিয়াক। একই কো-ইনসিডেন্স্ দুই বার ঘটা সেই সাথে নিঃসঙ্গতা আপনাকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। আপনার চিকিৎসা দরকার। আপনি আমার মেন্টাল ক্লিনিকে ভর্তি হোন। আমি আপনার চিকিৎসা করব। আপনি ভাল হয়ে যাবেন।'

'আপনার পরামর্শ আমি নিচ্ছি না। কারণ আমি সিজোফ্রেনিয়াক নই। আমার বিশ্বাস খুব শিগগিরই আপনার টেলিফোনটা বেজে উঠবে। একটি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পাবেন আপনি।'

'আপনি আসুন রকিবুল হোসেন সাহেব।' ড. আসগর আলীম ঠিক করলেন এই পাগলকে আর প্রশ্রয় দেবেন না। 'আপনি যদি বেশি বোঝেন তবে আর আমার কাছে এসেছেন কেন? কোনও ভূতের ওঝা খুঁজে বের করুন। আপনাকে কোনও ফিস দিতে হবে না, কারণ আমি আপনার কোনও চিকিৎসা করিনি। আর আমার ফোনটা দু'দিন যাবৎ ডেড। ঠিক হতে হপ্তাখানেক লাগবে। সুতরাং বাজার প্রশ্নই ওঠে না।'

এই প্রথম রকিবুল হোসেনের ঠোঁটে হাসি ফুটল। কোনও মহামূর্খের বোকামি দেখে যেমন কোনও বুদ্ধিমানের মুখে মারফতি

হাসি খেলে সেরকম। সেই সাথে তাঁর চোখও চিক্‌চিক্‌ করে উঠল। কোনও কথা বললেন না তিনি। লম্বা টান দিলেন সিগারেটে। তারপর আধখাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

ড. আসগর আলীম মহাবিরক্ত মুখে উঠে পড়লেন। বাড়ি ফিরতে হবে। একবিন্দুও শান্ত হয়নি বাইরের উন্মত্ত প্রকৃতি। তাতে কোনও অসুবিধা নেই। তাঁর গাড়ি আছে। আজকের সন্ধ্যাটাই নষ্ট হয়ে গেছে পাগলটার জন্য।

টেবিলে রাখা টেলিফোনটা তারস্বরে বেজে উঠল। ধড়াস্‌ করে লাফ দিল ড. আসগর আলীমের হৃৎপিণ্ড। পরমুহূর্তে তাঁর চোখ চলে গেল দেয়াল ঘড়ির দিকে। রকিবুল হোসেনের হিসেব অনুযায়ী ঘড়িটা একেবারে সঠিক সময় জানান দিচ্ছে।

এটাও কি কোনও কাকতালীয় ঘটনা? আগামী সপ্তাহের আগে তো ফোন ঠিক হবার কথা নয়! ড. আসগর আলীম তাঁর কাঁপা কাঁপা হাত বাড়ালেন টেলিফোনের দিকে।

কলজে কাঁপানো শব্দে বাজ পড়ল কোথাও।

ইমরান খান

ট্রেনের কামরায়

মুকুলের বড় বোন থাকে কাপ্তাই, ক্যান্টনমেন্টে। দুলাভাই আর্মিতে, মেজর পদে কর্মরত। জায়গাটা এত সুন্দর! পাহাড় কেটে কেটে আর্মিরা যেন ছবির মত সাজিয়েছে এলাকাটা। গেলে আর আসতে ইচ্ছে করে না। বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ছে মুকুল– শেষ বর্ষ। ভার্সিটি কোনও উপলক্ষে বন্ধ থাকলেই সে ছুটি কাটাতে চলে যায় কাপ্তাই। সেখানে কী খাতির যত্ন। আর্মির বাবুর্চির রকমারী পদের সুস্বাদু রান্না, কাপ্তাই লেকের সদ্য ধরা টাটকা মাছ ভাজা– স্পীড বোটে ঘুরে বেড়ানো– আসতে যেতে আর্মির স্যালুট। বোন, দুলাভাইয়ের কাছে যেন জামাই আদরে থাকে।

এবারও তিন চারদিনের ছুটি পেয়ে গেল। একবার ভাবল যাবে না। বন্ধুবান্ধবদের সাথে ঢাকাতেই আড্ডা দেবে। কিছু নোট লেখা দরকার, লাইব্রেরি থেকে রেফারেন্স বইও এনেছে কতগুলো। এই ছুটিতে কাজটা শেষ করতে পারলে ভাল হত, ক্লাস শুরু হলে, মেহনত হয়ে যাবে বেশি। দোনোমনো করে অবশেষে মনস্থির করে ফেলল– না; যাবে। লোভনীয় ভ্রমণ বিলাস ত্যাগ করবার মত সবল চিত্তের ছেলে নয় সে। অতএব যাত্রার প্রস্তুতি। দূর পাল্লার বাস সার্ভিস এত চমৎকার যে ট্রেনে সাধারণত

যাতায়াত করে না ও। 'এস আলম' কোচটি ঢাকা থেকে সরাসরি কাপ্তাই বাজারে নামিয়ে দেয়। সেখান থেকে দুলাভাই এসে আর্মির জীপে করে নিয়ে যায় ক্যান্টনমেন্টে।

কোচের টিকিট করতে এসে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। 'এস আলমের' টিকিট পাওয়া গেল না। অন্য কোচেও যাওয়া যায়, কিন্তু আর কোনও বাস যায় না কাপ্তাই পর্যন্ত। চট্টগ্রামে নেমে আবার বহদ্দার হাট থেকে কাপ্তাই যাবার বাস ধরতে হয়। মুস্কিল হলো। চেহারা বেজার করে আকাশ পাতাল ভাবল কিছুক্ষণ– টিকিট যখন পেলই না, দরকার নেই এত ঝামেলা করে যাবার। খানিক খুঁতখুঁত করে অবশেষে ঠিক করল ট্রেনেই যাবে। রাতের ট্রেনে। জার্নি ও সবসময় রাতেই করে– খুব ভাল লাগে ওর কাছে। ট্রেনে যাবে যখন, প্রথম শ্রেণীর টিকিটই কাটল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া যাবে। ট্রেনের ছন্দোময় দুলুনিতে অন্যরকম আমেজের আরামদায়ক ঘুম হয়– যাত্রার ধকলটা খুব একটা গায়ে লাগে না। সকালে পৌঁছে কোনও হোটেলে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে সাড়ে ন'টার বাস ধরলেই হবে। আপাদের শুধু জানিয়ে দিতে হবে যে বাসে নয়, ট্রেনে যাচ্ছে– ব্যস।

টিকিট নিয়ে দু'একজন বন্ধুর সাথে দেখা সাক্ষাৎ সেরে দরকারি টুকটাক কিছু জিনিস কিনে বাসায় ফিরে এল। মাকে জানিয়ে দিল যে ট্রেনের টিকিট করেছে। আপাকে ফোনে জানিয়ে দিল গাড়ি বদলের কথা। তারপর ব্যাগ গুছাতে বসল।

বড় খালা এসেছিলেন। মার সাথে কথা বলে মুকুলের ঘরে এলেন।

এটা সেটা কথার পরে খালা জিজ্ঞেস করলেন, 'দু'দিনের জন্য যাচ্ছিস, এত বড় সুটকেস কেন? তোর কাপড় তো এক কোণে পড়ে আছে।'

মুচকি হেসে মুকুল জবাব দিল, 'সবুর করো, খালাম্মা, নিজের চোখেই দেখবে এত বড় সুটকেসের রহস্য।'

বলতে না বলতেই মা এলেন ঘরে। হাতে আচারের শিশি, এটা ওটা খাবারের বড় এক বোঝা নিয়ে। খালা হাসতে লাগলেন।

মুকুলও হাসল। 'এখন বুঝেছ তো? যাত্রা করছি তাঁর মেয়ের বাসায়, পর্বত প্রমাণ খাবারের বোঝা না নিয়ে উপায় আছে? মানা করেছিলাম একবার, মায়ের সে কী অভিমান, রাগ! যাওয়াটাই পণ্ড হয়ে যাচ্ছিল সেবার। এরপর থেকে আর ভুল হয় না।'

মা হাসলেন। 'ফাজিল ছেলে! সরে যা, আমি দিচ্ছি সব গুছিয়ে। দেখো তো, আপা? সামান্য কিছু জিনিস! নিতে ছেলের গায়ে যেন জ্বর আসে।'

চোখ কপালে উঠে গেল মুকুলের। 'সামান্য জিনিস? বেশ, হুকুম করো– পুরো ঢাকা শহরটা তুলে পৌঁছে দিচ্ছি তোমার মেয়ের কাছে, তা হলে তোমার জান ভরবে তো?'

কৃত্রিম রাগে বললেন মা, 'পারলে নিয়ে যা না? সত্যিই খুশি হব আমি– মা হওয়ার জ্বালা তুই কী বুঝবি?'

'বুঝতে চাই না, মা, যা দেবার ভাল করে গুছিয়ে দাও। তেলের কোনও খাবার টাবার দিয়ো না। সেবার আমার জামা কাপড়ে দাগ টাগ লেগে এক কেলেংকারি।'

ট্রেনে উঠে গুছিয়ে বসে এসব ভেবেই হাসল নিজের মনে। ঘড়ি দেখল– এখুনি ট্রেন ছেড়ে দেবে, সময় হয়ে এসেছে। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে পুরো ট্রেনটাকে দেখার চেষ্টা করল। অজগরের মত বিশাল লম্বা– আগা মাথা দেখা যায় না। কত শত যাত্রী নিয়ে আজ পাড়ি দেবে ট্রেনটা কত দূরের পথ– সারা রাত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন দম নিয়ে নিচ্ছে, শক্তি সঞ্চয় করছে

শেষবারের মত– এসব ভাবতে এত রোমাঞ্চ বোধ হয়।

কামরার ভেতর দৃষ্টি ফেরাল মুকুল। ওপরে নীচে মিলিয়ে চারটে সিট। নিজে নিয়েছে নীচেরটা। মহিলারা যদি কেউ আসেন, ওপরে উঠে যেতে হবে তাকে। একটু অবাক হলো– গাড়ি তো ছাড়বে এক্ষুণি, দুলতেও শুরু করেছে মৃদু মৃদু– কই, অন্য যাত্রী তো কেউ এল না?

যাকগে, কেউ না এলে ভালই হয়– বেশ হাত পা ছড়িয়ে যাওয়া যাবে। সিগারেটও টানা যাবে নিশ্চিন্ত আয়েশে এমনিতে, সিগারেট খুব একটা খায় না– গাড়িতে তো নয়ই, মা-বাবা টের পেলে বকেন, রাগ করেন। এখানে কেউ দেখবেও না– বকবেও না– তাই শখ করে ভাল এক প্যাকেট সিগারেট কিনে এনেছে। আরাম করে সিটে হেলান দিয়ে সবে বসেছে, গাড়িও চলতে শুরু করেছে– এমন সময়ে একজন যাত্রী হুড়মুড় করে এসে ঢুকল। মেজাজটা খাট্টা হয়ে গেল ওর। বিরক্ত হয়ে দেখল এই শেষ মুহূর্তে আসা আপদটার দিকে। বেশ লম্বা লোকটা, হালকা পাতলা গড়ন, রুক্ষ চেহারায় বলিরেখা স্পষ্ট– নিজের জায়গায় বসে হাঁপাতে লাগল লোকটি, কাশছেও সেই সাথে। উঁচু চোয়াল, বসা গাল। বয়স আন্দাজ করা গেল না। দেখলেই মনে হয়, আপাদমস্তক অশুভ একটি মানুষ। অস্বচ্ছ, হলদেটে দৃষ্টি মেলে চাইল লোকটি মুকুলের দিকে, চমকে গেল সে– মরা মানুষের চোখের চাহনি যেন। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

সারা রাত এর সাথে একই কামরায় থাকতে হবে ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল। লোকটাকে অসুস্থও মনে হচ্ছে। বিশ্রী চেহারার মানুষটা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী? বিস্মিত হলো। পরনের কাঁপড়চোপড়গুলো অবশ্য দামী, কিন্তু তাতে কী– চোর, ছিনতাইকারীরাও তো অনেক সময় ভাল কাপড়ই পরে। দূর এসব

কী ভাবছে! মানুষটা অদ্ভুত ঠিকই, কিন্তু ভূত তো আর নয়? নিজের মনেই হাসল মুকুল। ভীতু সে নয় মোটেই, ভূত-প্রেতেও বিশ্বাস নেই। কাল্পনিক ওসব জিনিস গল্প, সিনেমাতেই পাওয়া যায়।

কাশির শব্দে চমক ভাঙে তার, এত কাশছে কেন? ট্রেন ছুটে চলেছে গতিময় ছন্দে– টঙ্গী কখন পার হয়েছে, টের পায়নি। লোকটি যেমন কোনও কথা বলেনি, মুকুলও সেধে আলাপ করেনি, এতক্ষণ তো ভাবনার জগতেই বিভোর ছিল। একটু ইতস্তত করে বলল, 'আপনাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে? এভাবে একা আসাটা উচিত হয়নি।'

নিজেকে সামলে খরখরে, শুকনো ঠোঁটদুটি হাত দিয়ে মুছে নিয়ে তাকাল লোকটি, সেই অশুভ, নিষ্প্রাণ দৃষ্টি। আর একবার শিউরে উঠল মুকুল।

'আমি একা নই, সে সঙ্গে আছে।' কণ্ঠস্বরটি ভরাট, গম্ভীর।

রোগা, অসুস্থ, বিদঘুটে এক মানুষের এমন সুন্দর গলার স্বর ওকে বেশ অবাক করল। সেই সাথে কৌতূহলী– একা নয় বলল, কিন্তু আর তো কেউ নেই সাথে, বোধহয় অন্য কামরায় উঠেছে। যাকগে, ওর অত মাথা ব্যথা কেন? কামরার ভেতর অন্ধকার এখন। বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, ছেঁড়া, ছেঁড়া আলো যা আসছে, সেটা বাইরে থেকে, কখনও চাঁদের সামান্য জ্যোতি, কখনও ছোট কোনও স্টেশনের আলো। ঝড়ের বেগে ছুটছে যান্ত্রিক সরীসৃপ তার সবটুকু শক্তি দিয়ে। ছন্দোময় দুলুনিতে ঘুম চলে আসছে মুকুলের। লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকল, জমাট বাঁধা অন্ধকারের স্তূপ যেন। কিন্তু কী একটা অসংগতি রয়েছে লোকটার বসার ভঙ্গির মধ্যে– কী যেন চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। ধূমপানের নেশা জেগেছে, পকেটে হাত দিল সিগারেট বের করার

জন্য। হঠাৎই মুকুল বুঝতে পারল কেন ওর খটকা লেগেছিল, বসা অবস্থায় দেখে। লোকটি বসে আছে স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই, কিন্তু পাশে কেউ বসে থাকলে তার কাঁধের ওপর হাত রেখে লোকে যেমন করে বসে– এই লোকটিও ঠিক সেই ভঙ্গিতেই বসে আছে। হাতটি তার শূন্যেই রয়েছে, কারণ কেউ তো বসে নেই তার পাশে। একী বিভ্রাট! কী যন্ত্রণায় পড়া গেল! আমি পাগল? না কি ওই লোকটি? কী হচ্ছে এসব? চোখের ভুল?

ঠিকমত দেখল আবার, না, ভুল দেখেনি। সিগারেট বার করল, হাত কাঁপছে অল্প অল্প। দেশলাই জ্বালাতে যাবে, আর্তনাদ করে উঠল লোকটি, 'জ্বালাবেন না, আগুন জ্বালাবেন না।' হতভম্ব মুকুলের হাত থেকে দেশলাই কাঠি, সিগারেট দুটোই পড়ে গেল।

রাগে গা জ্বালা করে উঠল মুকুলের, কঠিন সুরে বলল, 'মানে কী এর? আগুন না জ্বালালে সিগারেট ধরাব কেমন করে? আপনি কি বিনা আগুনে সিগারেট খান?'

একটু অপ্রতিভ ম্লান সুরে বলল সে, 'আমি সিগারেট খাই না।'

'পুরুষ মানুষ সিগারেট খায় না এমন আজব প্রাণী জগতে আছে?' বিরক্তির সুরে বলল মুকুল। 'বেশ, ভাল কথা। কিন্তু আমি খেলে আপনার অসুবিধাটা কোথায়? মহিলা সাথে থাকলেও না হয় বুঝতাম।'

নিজের পাশে একবার তাকাল লোকটি, তারপর নিষ্প্রাণ সুরে বলল, 'আপনি খেলেও আমার আপত্তি আছে, কারণ একজন মহিলা আছে আমার সাথে।'

এই উদ্ভট কথায় মুকুল রেগে গেল। 'কোথায় আপনার মহিলা? দিব্যি একাই তো বসে আছেন। আমি তো কাউকেই দেখছি না।'

'আছে, আমার পাশেই বসে আছে।'

তারপর নিবিড় করে আরও কাছে টেনে নেবার ভঙ্গি করল সে। 'কেউ দেখতে পায় না তাকে, আমি ছাড়া।'

এবার সন্দেহ নয়, বিশ্বাস দৃঢ় হলো মুকুলের। লোকটি বদ্ধ পাগল।

'আমার দেখার দরকারও নেই, আপনার আচরণ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, টিকিট কেটে আমিও উঠেছি, সামান্য একটা সিগারেট খাবার অধিকার অবশ্যই আছে।'

বিষণ্ন মুখে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল লোকটি। মুকুলের কথায় কান না দিয়ে আপন মনেই বলতে লাগল, 'কেউ বিশ্বাস করে না, আমার কথা কেউ সত্যি বলে মেনে নেয় না, কিন্তু যখন বিশ্বাস করে, তখন আর কোনও উপায় থাকে না।'

আর সহ্য হলো না মুকুলের, উঠে দাঁড়াল, ইচ্ছে করছিল প্রচণ্ড এক ঘুসি মারে লোকটির মুখে, এই চালবাজি কথা শুনতে আর ভাল লাগছে না। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরে সিগারেট খাবে– এই পাগলের সাথে বাক্য ব্যয় বৃথা। দরজার হাতল ঘুরিয়ে থমকে গেল, খুলছে না, আটকে গেছে কোনভাবে। আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করবার পরও যখন খুলল না, তখন নিরাশ হয়ে নিজের জায়গায় এসে বসল।

লোকটি এতক্ষণ লক্ষ করছিল ওকে, এবার হাসিমুখে বলল, 'খুলবে না দরজা।'

'মানে? আপনি জানলেন কীভাবে?'

'আমি জানি। আমার সাথী চায় না যে আপনি বাইরে যান, তাই ও দরজা আটকে দিয়েছে।'

এবার একটু ভয় করতে লাগল মুকুলের। কেমন অস্বস্তিও লাগছে। সারারাত এক আজব উন্মাদের সাথে এই বন্ধ কামরায় থাকতে হবে তাকে– কী সব আবোল তাবোল আজগুবী কাণ্ড,

কথাবার্তা সহ্য করতে হবে। লোকটি যদি মেরেও ফেলে তাকে, কেউ জানতে পারবে না। ছুটন্ত গাড়ির শব্দে চিৎকার করলেও কেউ শুনবে না। একলা, সম্পূর্ণ একলা, অসহায় ভাবে আটকা পড়েছে এখানে।

প্রথম বারের মত উপলব্ধি করল সে, ওরা দু'জনে ছাড়াও তৃতীয় কারও অস্তিত্ব অনুভব করা যাচ্ছে– কীভাবে, সেটা বলতে পারবে না। চোখে এখনও কিছু দেখতে পায়নি, কিন্তু স্পষ্ট মনে হচ্ছে, আছে– আরও একজন কেউ আছে।

মুকুলের প্রতিক্রিয়া খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছিল লোকটি। এবার হাসল। 'বুদ্ধিমান ছেলে আপনি, বুঝতে পেরেছেন, তাই না? সত্যি আপনার মত কাউকে পাইনি আমরা। খুব বুদ্ধি– ভাল, ভাল।' হাসতেই লাগল লোকটি।

মুকুল চিৎকার করে উঠল, 'থামুন, কী ভেবেছেন আপনি? আপনার পাগলামি সহ্য করব আমি সারারাত? এখনি চলে যাচ্ছি অন্য কামরায়।' দ্রুত নিজের জিনিস গুছাতে লাগল।

এবার যেন পুরুষের কণ্ঠস্বরের সাথে আবছা মেয়েলী হাসির শব্দও পাওয়া গেল। ভয় পেলেও দমল না সে, সুটকেসটা নিয়ে দৃঢ় পায়ে দরজার কাছে পৌঁছে খুলতে চেষ্টা করল, পারল না এবারও। ঘেমে নেয়ে গেল ও– অবশেষে লাথি মারতে লাগল দরজার গায়ে। বিদ্যুৎ গতিতে এসে পিছন থেকে লোকটি তাকে জড়িয়ে ধরে টেনে এনে বসিয়ে দিল সিটের ওপর, তারপর বিশ্রী ভাবে ধমকে উঠল, 'বলেছিলাম না খুলতে পারবেন না? কোথাও যাচ্ছেন না আপনি, চুপ করে বসে থাকুন।'

অবাক হলো মুকুল লোকটির দৈহিক শক্তির প্রমাণ পেয়ে। রোগা, অসুস্থ একটি মানুষ কী অনায়াসে ওকে টেনে এনে বসিয়ে দিল, যেন সে ছোট বাচ্চা।

মিনতির সুরে মুকুল বলল, 'দেখুন, আপনাকে আমি চিনি না, নামটা পর্যন্ত জানি না, শত্রুতা থাকার কথা নয়– কেন এমন করছেন আমার সাথে? যেতে দিন আমাকে।'

'ঠিক, আমরা কেউ কাউকে চিনি না। আর নাম? কী হবে নাম জেনে? আর শত্রুতার কথা বলছেন? না, না, আপনি আমাদের পরম মিত্র। যে উপকার আমাদের করবেন আপনি আজ, তারপর...'

বাধা দিয়ে মুকুল বলল, 'কী চান আপনি? টাকা পয়সা? বেশি নেই, যা আছে সব দিয়ে দিচ্ছি, হাতঘড়িটা, আংটি– আর কিছু নেই আমার কাছে– সব নিয়ে আমাকে যেতে দিন। কথা দিচ্ছি, কাউকে আপনার কথা বলব না।'

উচ্চস্বরে হেসে উঠল লোকটি। 'আরে, কী কাণ্ড, আমাকে আপনি ছিনতাইকারী ভেবেছেন?' পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার কোনও অভাব সে রাখেনি। যখন যা চেয়েছি, তাই পেয়েছি, শুধু বিনিময়ে দিতে হয়েছে...' বলতে বলতে থেমে গেল লোকটি।

নিয়তির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে মুকুল। বেড়াতে এসে যে ভয়াবহ ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে– এ থেকে মুক্তি পাবে কিনা কে জানে। লোকটির কোনও কথাই আর শুনছে না ও। আপনজনদের কথা মনে পড়ছে। কদিন আগেও মা বলছিলেন, 'মুকুল, বাবা, তোর জন্য সুন্দর একটি মেয়ে পছন্দ করে রেখেছি, তোর পরীক্ষাটা হয়ে যাক। ধুমধাম করে বিয়ে দেব তোর।'

মুকুল বলেছিল, 'কাজ কর্ম করি না, কিছু না, নিজেই খাচ্ছি বাবার হোটেলে, বউকে খাওয়াব কী?'

'সে আমি বুঝব, বিয়ে করব না বললে হবে না, তুই আমার একমাত্র ছেলে– কত সাধ, বউ নিয়ে সংসার করব...'

'বউ যদি ডাল ভাতে সন্তুষ্ট না থাকে? যদি চাইনিজ ফাস্ট ফুড ইত্যাদি খেতে চায়?'

'যা খেতে চাইবে, তাই খাওয়াব– তবু তুই রাজি হয়ে যা।'

এসব কথা মনে হতে মুকুলের গলার কাছে কান্না জমে থাকল। ওর অবচেতন মন বলছে– আজ তার নিস্তার নেই– কখনও ফিরে যেতে পারবে না আর পরিচিত পরিবেশে– প্রিয়জনদের কাছে।

ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে ট্রেন। কোনও স্টেশনে থামছে না– কারণ বাংলাদেশ রেলওয়ের এই নতুন এক্সপ্রেস যন্ত্রদানব তার গন্তব্যে পৌঁছার আগে কোথাও থামবে না। যে ছন্দময় দুলুনিতে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ার লোভ ছিল মুকুলের, সেই ঘুম উধাও হয়েছে চোখ থেকে। নিস্তেজ, নীরব হয়ে বসে রইল।

বলে চলেছে লোকটি, 'জানেন, ও আমাকে খুব ভালবাসে। কখনও রাগ করে না আমার ওপর। বরং কী করলে আমি খুশি হব, আনন্দ পাব সে নিয়েই সারাক্ষণ অস্থির থাকে। তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে ও খুব রেগে যায়। আমার পক্ষেও তখন সামলানো খুব কঠিন হয়ে যায়। শুনবেন? কখন ও ক্ষেপে যায়? যখন আমি...'

নীরস স্বরে মুকুল বলল, 'সেই শুরু থেকে তো শুনে যাচ্ছি আর একজনের কথা– কে সে? কোথায় সে?'

লজ্জিত স্বরে লোকটি বলল, 'ওর পরিচয়টা বলিনি বুঝি? শুনুন তা হলে– সে এক মজার কাহিনি। ওর সাথে আমার প্রথম দেখা হয় এক চাঁদনী রাতে। কয়েক বন্ধু মিলে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়েছিলাম। সে বেশ কয়েক বছর আগের কথা। টগবগে, তাজা, প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরপুর সব যুবক– সদ্য কৈশোর পেরনো। একদিন রাতে, ঘুম আসছিল না, একাই সমুদ্র সৈকতে চলে গেলাম। বয়স

ছিল কম– অফুরন্ত প্রাণশক্তি– ভয়ডর কাকে বলে জানি না। সৈকতে বসে আছি– সুনসান, নির্জন। সামনে বিশাল সাগরের অবিরাম গর্জন– গোল চাঁদ উঠেছে আকাশে– তারই স্নিগ্ধ হলদে আভায় ঝলমল করছিল চারদিক। মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির মনোরম শোভা দেখছিলাম– এই সময় সামনে এসে দাঁড়াল ও।' একটু থামল লোকটি।

স্বরটা এবার কেমন বিষণ্ন, করুণ শোনাল– 'ঝলমলে সুন্দরী এক নারী। কী মিষ্টি করে হাসল আমার দিকে চেয়ে– সেই মুহূর্ত থেকেই আমি ওকে ভালবেসে ফেললাম। চাঁদনী রাতে দেখা হয়েছিল তাই ওর নাম দিলাম চাঁদনী। তারপর থেকে ও আমার সাথেই আছে। আমার সংসার– বউ, দুই বছরের মেয়ে– সব হারিয়ে গেল জীবন থেকে– ফিরে যেতে পারলাম না আর, সম্ভবই ছিল না। চাঁদনী আমাকে নতুন জীবনের আস্বাদ পেতে শেখাল। কী যে উন্মাদনা, শিহরণ, বৈচিত্র্যের স্বাদ– আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমাকে চাঁদনী প্রচুর ধন সম্পদ দিয়েছিল। আমার দরকার ছিল না সেসবের– দিয়ে দিলাম স্ত্রীকে, যাতে ওরা ভালভাবে বাঁচতে পারে আমাকে ছাড়া। শর্ত করে নিয়েছিলাম চাঁদনীর সাথে– আমার পরিবারের কোনও ক্ষতি হতে দেব না। আমি তো শেষ হয়ে গিয়েছিলাম আগেই, কিন্তু ওরা যেন ভালভাবে বেঁচে থাকে। চাঁদনী খুব লক্ষ্মী মেয়ে– মেনে নিল আমার শর্ত– কিন্তু তার বদলে ওর জন্য জোগাড় করতে হয় তাজা, টগবগে, লাল গরম রক্ত...

আঁতকে উঠল মুকুল– কী ভয়ানক কথা, কী বলছে লোকটি? রক্ত খায় চাঁদনী নামের অদৃশ্য মেয়েটি? কীভাবে জোগাড় করে রক্ত? কে চাঁদনী? এই লোকটিই বা কে? কাদের পাল্লায় পড়ল সে?

ভয়ে, আতঙ্কে কাঁপতে লাগল মুকুল। 'কে আপনি? এসব কী বলছেন? কেন?'

হা হা করে হেসে উঠল লোকটি। 'ভয় পাচ্ছেন? না, না ভয়ের কিছু নেই। আপনারা ঠাণ্ডা পানীয় খেতে পছন্দ করেন, আমরা পান করি টাটকা গরম রক্ত– এতে বুঝি দোষ হলো?' ব্যাজার হয় লোকটি।

ভেবে পেল না মুকুল, কী বলবে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ভয়ঙ্কর এক পিশাচের খপ্পরে পড়েছে সে– অবিশ্বাস্য হলেও– সত্যি– কীভাবে রক্ষা করবে নিজেকে?

'তরতাজা তরুণ রক্ত খেতে বেশি ভাল।' রসিকতার সুরে হাসছে দানব। 'সুযোগ, সুবিধা অবশ্য সব সময় পাওয়া যায় না। চাঁদনী যেমন, আমার রক্ত খেয়ে প্রায় শেষ করে ফেলল– আসলে ওর দরকার ছিল একজন সঙ্গীর– তাই তো সৈকতে আমাকে একা পেয়ে বন্ধুত্ব করতে চলে এল। বেশিদিন রক্ত না খেয়ে থাকলে আমরা কেমন শুকিয়ে যাই। বয়সের ছাপ পড়ে– শক্তিহীন হয়ে পড়ি। চাঁদনীও খেতে না পেয়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে আমার রক্ত পেয়ে আবার সতেজ হয়ে উঠল। আমিও হয়ে গেলাম ওর মত। তারপর দুজনে মিলে আমার বন্ধুদের রক্ত খেয়ে শেষ করলাম। আহ্, সেই সুস্বাদু রক্ত– আজও যেন জিভে লেগে রয়েছে,' লোভীর মত জিভ বের করে শুকনো ঠোঁট চাটল পিশাচটি।

দ্রুত উঠে দাঁড়াল মুকুল। পালাতে হবে, যেভাবেই হোক, রক্ষা করতেই হবে নিজেকে।

ওকে উঠতে দেখে ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল পিশাচটিও। হাসল দাঁত বের করে। লম্বা দুই তীক্ষ্ণ দাঁত দেখা গেল। ঝকঝকে সাদা।

রুক্ষ হাসি হাসতে হাসতেই বলতে থাকল, 'রক্ত জোগাড় করতে না পারলেই পিশাচী (সস্নেহে মানুষ যেমন পাগলী বলে) আবার ক্ষেপে যায়, রাগ করে, অভিমানে কথাই কয় না, বুড়োদের রক্ত খেতে ওর নাকি ঘেন্না করে– আচ্ছা, আপনিই বলুন, এত তরুণ তাজা রক্ত আমি কেমন করে জোগাড় করি?'

ভয়ার্ত স্বরে মুকুল বলল, 'বেশ শৌখিন পিশাচী দেখছি! যাই হোক, খুব সুন্দর একটি ভৌতিক কাহিনি শোনালেন এতক্ষণ– তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। দরজা খুলে দিন দয়া করে, আমি চলে যাই, তারপর যতখুশি আনন্দ করুন আপনার সঙ্গিনীকে নিয়ে।'

ওর কথা যেন শুনতেই পায়নি– আড়মোড়া ভেঙে চোখের পলকে দরজার সামনে যেয়ে দাঁড়াল পিশাচ– কী বিশাল দেখাচ্ছে ওটাকে। পুরো দরজাটাই ঢেকে গেছে!

'উহ্, ভীষণ পিপাসা পেয়েছে– কত বকবক করলাম– গলাটা শুকনো কাঠ হয়ে গেছে একেবারে– কী বললে পিশু মণি? তোমারও তৃষ্ণা লেগেছে? আহারে সোনামণি আমার, চাঁদনী, চাঁদু, আর একটু ধৈর্য ধরো– এই তো নাগালের মধ্যেই আছে আমাদের তৃষ্ণা মেটাবার ব্যবস্থা।'

ফস্ করে একটা দেশলাইর কাঠি জ্বালাল মুকুল। সিগারেট খেতে না পেরে আবার পকেটেই রেখে দিয়েছিল, মনে পড়তেই কোনমতে দেশলাই বের করে আগুন জ্বালল। হ্যাঁ, আগুন– নিষেধ করেছিল শয়তানটা ওকে আগুন জ্বালতে– হয়তো এই আগুনই এখন রক্ষা করতে পারে ওকে। আগুন দেখে পিশাচটির লাল চোখে ভীতি দেখা গেল– এতক্ষণের দেখা লোকটির সাথে ওর সামনে দাঁড়ানো শয়তানের চেহরাটির কোনও মিলই নেই– অপার্থিব ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

কয়েকটা কাঠি জ্বালতে পারল মুকুল।

হঠাৎ ভয়ের ভাবটা কেটে গেল পিশাচটির চেহারা থেকে। মুকুলের পিছনে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর হাসি ফুটে উঠল মুখে। ভুলেই গিয়েছিল মুকুল আরেকজনের অস্তিত্ব– ঝট করে পেছন ফিরে তাকাল ও। দেখল প্রেতলোকের বিভীষিকাময় অন্য পিশাচীটি নিজের রূপ ধারণ করেছে– অদ্ভুত রূপসী, কিন্তু চোখে অমানুষিক দৃষ্টি– লাল ঠোঁটের ফাঁকে বেরিয়ে আছে শ্বদন্ত– তীক্ষ্ণ, ধারাল– সাদা। এত নারকীয়, ভয়াবহ চেহারা– মুকুল আর সহ্য করতে পারল না– ভীষণ মানসিক চাপ সয়েছে সে এতক্ষণ– দুই হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে উঠল– 'বাঁচাও! কে কোথায় আছ, বাঁচাও আমাকে!'

পুরুষটি রক্ত হিম করা গর্জন করে উঠল, 'মিস্টার ইয়াং, অনেকক্ষণ আমরা উপোসী ছিলাম– এখানে তোমাকে কে বাঁচাবে? সুতরাং আমরা এখন নিশ্চিন্তে তোমার সুস্বাদু তাজা রক্ত পান করব।' এগিয়ে এসে চেপে ধরল সে মুকুলকে।

নিজেকে ছাড়াবার বৃথা চেষ্টা করল মুকুল।

এবার এগিয়ে এল পিশাচী– দুজনে মুকুলকে চেপে ধরল কঠিন বাঁধনে, তারপর একই সাথে দাঁত বসিয়ে দিল ওর গলার দুই পাশের শিরায়। ছটফট করতে লাগল মুকুল, ছাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেল, কিন্তু দুই ভয়াবহ পিশাচের অশুভ মিলিত শক্তির সাথে পেরে উঠল না। রক্তচোষারা রক্ত টেনেই যেতে লাগল– চুষে নিতে লাগল ওর তাজা লাল রক্ত। জীবনের সব স্বপ্ন ভেঙে গেল, পরাজিত হলো অসহায় এক তরুণ প্রাণউচ্ছল জীবন।

নিস্তেজ হয়ে গেল মুকুল, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হতে হতে ক্ষীণ হয়ে এল। আর কোনও ব্যথা অনুভব করল না সে। অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। শেষ কথাটা অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল, "মা"।

চট্টগ্রাম স্টেশনে মহা শোরগোল শুরু হয়েছে। ঢাকা থেকে যে ট্রেনটি এসেছে আজ, তার প্রথম শ্রেণীর একটি কামরায় এক যুবকের লাশ পাওয়া গেছে। কেমন করে, কী উদ্দেশ্যে হতভাগ্যটি খুন হলো, পুলিশ আন্দাজ করতে পারল না। জিনিসপত্র সবই রয়েছে– ছুরি বা গুলির কোনও আঘাত নেই শরীরে। গলার দুই পাশে শুধু কিছুটা জায়গা রক্তাক্ত হয়ে আছে– কিন্তু কীসের এই ক্ষত, হতভম্ব পুলিশ তাও বুঝল না। সাদা হয়ে যাওয়া চেহারায় বিস্ফারিত খোলা চোখে তখনও আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। কী দেখে ভয় পেয়েছিল, জানা গেল না। লাশটির কঠিন হয়ে যাওয়া একটি হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা ছিল একটি দেশলাই।

নাজনীন রহমান

মৌমির প্রেতাত্মা

বেসরকারী এক পুরানো কলেজ। সামনে ডিগ্রি পরীক্ষা থাকায় প্রায় এক মাসের জন্য কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। হোস্টেলের ছাত্রীরা অনেকেই যে যার মত চলে গেছে গতকালই। জাকিনকে চট-জলদি গোছগাছ করতে বলে সিঁড়ি টপকে উপরে উঠে গেল হেলেন ও ডোরা। ওরা তিন জন এক সঙ্গে একই বাসে বাড়ি ফিরবে। জাকিন নেমে যাবে মধুখালি বাজারে। আর হেলেন ও ডোবা যাবে মাগুরা পর্যন্ত।

মেয়েদের হোস্টেল দোতলা হলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা একেবারেই অসুন্দর। হোস্টেলের পিছনে অনেকটা জায়গা জুড়ে গাছপালা, লতাপাতা আর বাঁশ ঝাড়ে ছাওয়া। কেমন যেন গেঁয়ো গেঁয়ো ভাব। অবশ্য সবই কলেজ সীমানার মধ্যে। হোস্টেলের পশ্চিম দিকে সারি সারি বাথরুম। উপর-নীচে একই সিস্টেম। জাকিন মুখ হাত ধোয়ার জন্য বাথরুমের কাছাকাছি গিয়েই চমকে উঠে থমকে দাঁড়াল। ভাল করে তাকাল শেষ বাথরুমটার দিকে। সাথে সাথে ভয়ে জিভ শুকিয়ে গেল ওর। দরজার ফাঁক দিয়ে রান পর্যন্ত কাটা একটি পা বেরিয়ে আছে। রক্ত ঝরে পাংশু বর্ণ হয়ে আছে।

তখনই জাকিনের দাঁত লেগে পড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু পড়ল

না। ভয়ে চিৎকারও করল না। দ্রুত রুমে এসে কাঁপা হাতে ঢক ঢক করে গ্লাসের সবটুকু পানি শেষ করে ধপাস করে বসে পড়ল বিছানায়। ভাবল, আমি কি ভুল দেখলাম! আমি কি এখন চিৎকার করব, না চুপচাপ কেটে পড়ব এখান থেকে? কেউ যদি খুন হয়ে থাকে অথবা আত্মহত্যা করে থাকে, তা হলে পুলিশ এসে হয়তো তাকেই সন্দেহ করে বসবে। উটকো ঝামেলা এসে পড়বে আমার ঘাড়ে। কিছুই ভাবতে পারছে না জাকিন।

ঠিক তখনই একটি মেয়ে এসে বসল জাকিনের বিছানায়। সে বলল, 'তুমি এখনও যাওনি?'

'যাব।'

'তোমাকে কেমন অস্থির অস্থির লাগছে।'

'কই, না তো। হেলেন আর ডোরা ওপর থেকে এলেই আমরা রওনা করব। তাই একটু তাড়াহুড়ো।'

'কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভয় পেয়েছ। সত্যি করে বলো তো কেন ভয় পেয়েছ?'

জাকিন নিজেকে একটু হালকা করার জন্যই বলল, 'রুমা আপা, সত্যি আমি একটা বিশ্রী জিনিস দেখে ভয় পেয়েছি। বাথরুমের দরজার ফাঁক দিয়ে কার যেন একটা কাটা রান বেরিয়ে আছে। জানাজানি হয়ে গেলে যে কী হবে।'

রুমা ওই কলেজেরই ছাত্রী। তবে জাকিনদের সিনিয়র। দোতলায় থাকে। জাকিনের কথায় রুমা একটু হাসল। তারপর, তার পরনের শাড়িটা টেনে তুলে বলল, 'দেখো তো, এই পা-টা নাকি?'

জাকিন সেদিকে একবার তাকিয়ে 'ডোরা' বলে একটা চিৎকার দিয়েই ঢলে পড়ল বিছানায়। ডোরা আর হেলেন সিঁড়ি থেকেই শুনতে পেল জাকিনের চিৎকার। তখনই ছুটে নীচে এসে

দেখল জাকিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বিছানায়।

হৈ চৈ শুনে ছুটে এল আরও অনেকেই। বার বার চোখে মুখে পানির ছিটা দিতে দিতে জ্ঞান ফিরল জাকিনের। ডোরা বলল, 'কী রে, কী হয়েছে? হঠাৎ অমন চিৎকার করলি কেন?'

জাকিন দু'হাতে ওদের শক্ত করে ধরে চারদিক একবার তাকাল। এদের মধ্যে রুমাকে না দেখে বলল, 'রুমা আপা কোথায় গেল?'

হেলেন বলল, 'কী বলছিস তুই! রুমা আসবে কোথা থেকে? সে তো গতকালই চলে গেছে।'

ডোরা বলল, 'ঘটনা কী খুলে বল তো?'

জাকিনের চোখে মুখে ফুটে আছে আতঙ্কের ছায়া। চোখের উপর ভাসছে রুমার কাটা পা। ব্যাপারটা যে রহস্যময়, এটা বেশ বুঝতে পারল জাকিন। তবু বলল, 'সবাই আমার সাথে একটু চলো তো।'

ডোরা বলল, 'কোথায়?'

'বাথরুমের সামনে।'

আট-দশজন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাথরুমের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল জাকিন। বাথরুমের দরজাটা তেমনি ফাঁকা রয়েছে, কিন্তু ওখানে সেই কাটা পা-টা নেই। মেয়েরা বলল, 'কী দেখছিস?'

'এখানে নয়, রুমে চল, সব বলছি।'

তখনই সবার মনের মধ্যে দুর্ভাবনার এলোমেলো একটা ছবি ভাসতে লাগল। সবাই গভীর আগ্রহে চেয়ে থাকল জাকিনের মুখের দিকে। জাকিন তখন ধীরে ধীরে বর্ণনা করল সব ঘটনা। ঘটনা শুনে মেয়েরা তো একেবারে চুপ হয়ে গেল।

হেলেন বলল, 'এখন আর এ নিয়ে কোথাও কিছু বলার প্রয়োজন নেই। সবাই বাড়ি থেকে ফিরে এসে তারপর

প্রিন্সিপালের কাছে যাওয়া যাবে।'

তখন অন্যরাও হোস্টেল ছাড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ফরিদপুর থেকে মধুখালির দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। মধুখালি বাজারে এসে বাস থামলে জাকিনের সাথে হেলেন ও ডোরাও নেমে পড়ল। জাকিনকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে পরদিন সকালে ওরা দু'জন মাগুরার বাস ধরবে। একটা বেবি নিয়ে তিনজন পৌঁছাল জাকিনদের বাড়ি। জাকিনের বাবা-মা খুব খুশি হলো ওদের দু'জনকে দেখে।

বিকালে জাকিনদের বড় টিনের ঘরের গ্রিল ঘেরা চওড়া বারান্দায় চা-নাস্তা খেতে বসল সবাই। গল্পের এক ফাঁকে জাকিন নিজেই হোস্টেলের ঘটনাটা বর্ণনা করল মায়ের কাছে। ঘটনা শুনে ওর মায়ের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। মা বললেন, 'এমন হোস্টেলে তোমাদের কারও আর থাকার দরকার নেই। ভাল পরিবেশ দেখে তোমরা তিনচারজন মিলে একটা বাসা নাও। বাড়ি থেকে চাল-ডাল নিয়ে গেলে খরচ খুব বেশি পড়বে না। বাড়ি গিয়ে এ ব্যাপারে তোমরা কথা বলো।'

ভূত-প্রেত কেউ ইচ্ছে করলেই দেখতে পায় না। আবার কেউ ইচ্ছে না করলেও তার সামনে এসে হাজির হয়। জাকিনের মায়ের মনে বাসা বাঁধতে লাগল নানা ভাবনা। কেননা, জাকিন খুবই সুন্দরী মেয়ে। শুধু সুন্দরীই নয়, ওর মত মিষ্টি মেয়ে খুব কমই চোখে পড়ে। মেয়ে সুন্দরী হলে এই এক বিপদ। তাকে ধরে রাখা যায় না। মানুষ, জিন, ভূত সবারই চোখ পড়ে। বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে চারদিক থেকে। যে কারণে জাকিন কলেজে পা রাখার ছয় মাসের মধ্যেই ওর বিয়ে হয়ে গেল।

ছেলেদের আদিবাস ফরিদপুরেই। তবে ঢাকাতে রয়েছে বিশাল বাড়ি। ছেলেটির নাম তৌহিন। বাবা হাইকোর্টের

অ্যাডভোকেট। তৌহিন বিয়ে করার পরপরই চলে গেছে আমেরিকা। জাকিনকে এখনও তুলে নেয়নি। এমনই কথা রয়েছে যে তৌহিন আমেরিকা থেকে ফিরে এলেই বৌ তুলে নেয়া হবে। তারপর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চলে যাবে আমেরিকা। কিন্তু এর মধ্যে যদি মেয়ের কোন অঘটন ঘটে যায় তা হলে আরেক ঝামেলায় পড়তে হবে। জাকিনের মায়ের মনে এই চিন্তা হতে লাগল যে এই দৃশ্য অন্য কোন মেয়ের চোখে না পড়ে জাকিনের চোখে পড়ল কেন? তবে কি সেই অদৃশ্য জিন বা ভূত জাকিনের ঘাড়ে আসতে চায়?

এক সপ্তাহ পরের ঘটনা। রোজকার মত টিভি রুমে সবাই টিভি দেখছে। রাত তখন ন'টার বেশি নয়। হঠাৎ জাকিনের ঘরে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ কানে এল সবার। মা বললেন, দেখ তো কী পড়ল। দৌড়ে গেল জাকিন। ওর মনে হলো একটা ছায়া চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকা মেঝের উপর পড়ে আছে দশ-বারো সাইজের ফটো ফ্রেম। উপরের গ্লাস চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারদিক। জাকিনের বুকের মধ্যেও যেন ছড়িয়ে পড়ল টুকরো টুকরো ভালবাসার কণ্ঠ। কেননা ওই ফ্রেমে রয়েছে জাকিন আর তৌহিনের যুগল ছবি। রাগে চিৎকার দিয়ে মাকে ডাকল জাকিন।

ফ্রেমটা টেবিল বরাবর দেয়ালে ঝুলানো ছিল। ফ্রেমে বাঁধা রশিটাও ঠিক আছে। আবার দেয়ালে পোঁতা তারকাঁটাটাও তেমনি রয়েছে। তা হলে ফ্রেমটা পড়ল কীভাবে। বাড়িতে একটা বিড়াল আছে, তবে বিড়ালের দ্বারা এমনটি হয়েছে বলে কেউ মনে করল না। জাকিন দ্রুত হাতে ফ্রেমটা তুলতে গিয়ে অবাক। একি! এর মধ্যে ছবি কই।

জাকিনের মা বিস্মিত চোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে

বললেন, 'বলিস কী? ছবি নেবে কে!'

ঘরটার পিছন দিকের জানালাটা খোলা। বাইরে সুপারী ও নারকেল বাগান। তার ওপাশে পুকুর। জাকিন এগিয়ে গেল জানলার কাছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। ঘরের পিছনের লাইটটা জ্বেলে দিতেই দেখা গেল সুপারী গাছের আলো ছায়ায় পড়ে আছে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া সেই ছবিটা। মায়ের পরান আঁতকে উঠল। একি অলক্ষুণে কাণ্ড। জাকিনের মুখে কোন কথা নেই। শুধু ওর চোখ থেকে ঝরে পড়ল ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

আবার সবার মনের মধ্যে উদয় হলো সেই কাটা রানটা। জাকিনের বাবা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি ছুটলেন নলিয়া গ্রাম রেল স্টেশনে। স্টেশনের পাশেই পরিত্যক্ত একটি ভাঙা ওয়াগনের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে আস্তানা গেড়ে আছে এক ফকির। ফকিরের গলায় লাল, নীল, সবুজ এবং সাদা রং-এর বেশ বড় বড় পাথরের মালা। একটা বাঘের চামড়ার উপর বসে থাকে রাতদিন। চুল দাড়িতে একাকার। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বলে কথা নেই, বারো মাসই উদোম গা। তার সঙ্গী-সাথীর মধ্যে দু'টি কুকুর আর দু'টি বিড়াল। প্রায়ই দেখা যায় একটি বিড়াল ফকিরের ঘাড়ের উপর বসে আছে। সবসময়ই দূর-দূরান্তের মানুষ এসে ভিড় করে থাকে। তবে গরীব লোকের সংখ্যাই বেশি।

এই ফকিরকে নিয়ে নানা কথা শোনা যায় মানুষের মুখে। কেউ বলে ফকির, কেউ বলে দরবেশ। সে যাই হোক, মানুষ তাকে ভক্তি করে। লোকে বলে ওটা বাঘের চামড়া নয়। জ্যান্ত একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। নিশিরাতে ওই বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে ফকির কোথায় যে হাওয়া হয়ে যায়, তা কেউ জানে না। তার গলার পাথরগুলোও নাকি মহামূল্যবান। কোথা থেকে কী করে যে ওগুলো পেয়েছে সে, শুধু সেই জানে। কিন্তু মানুষ

বলে, তার ভক্ত জিন-পরীরাই তাকে ওসব এনে দিয়েছে। অনেকবার নাকি দুষ্ট লোকেরা ওই পাথর ডাকাতি করার জন্য এসেছে। কিন্তু ওয়াগনের কাছাকাছি এসেই দৌড়ে পালিয়েছে প্রাণ নিয়ে।

এ সব কথা কাছে-দূরের সবাই জানে। যে কারণে মেয়ের জন্য জাকিনের বাবা জব্বার সাহেব ছুটে গেলেন সেখানে। তিনি সেই ওয়াগনের কাছে যেতেই উদ্ভট একটা গন্ধ নাক দিয়ে ঢুকে পেটের নাড়িভুঁড়ি ওলট-পালট করে ছাড়ল। তবু তিনি পিছপা হলেন না। একেবারে খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন মৌ-মৌ একটা সুবাস তিনি টের পেলেন। মনটা বিগলিত হয়ে উঠল। মেয়ের বিপদের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন তিনি।

ফকির তার লাল দু'টি চোখ মেলে চেয়ে থাকল জব্বার সাহেবের দিকে। তারপর বলল, 'ও খুনি, পালাবে কোথায়।'

জব্বার সাহেব কিছুই বুঝলেন না। অথচ উপস্থিত দু'চার জন লোক ফকিরের কথা শুনে অবাক চোখে তাকাল জব্বার সাহেবের দিকে। জব্বার সাহেব দিশা না পেয়ে আবার বললেন, 'ফকির বাবা, এখন আমি কী করব?'

ফকির বলল,' যা, বাড়ি যা!'

জব্বার সাহেব বাড়ি ফিরে এলেন। ফকিরের কথা বললেন সবাইকে, কিন্তু কেউ তার মর্মার্থ খুঁজে পেল না। কেউ কেউ বলল, 'আপনি শিক্ষিত মানুষ হয়ে কেন ওই সব ভণ্ডদের কাছে যান।' তিনি বললেন, 'চোখে দেখা জগতের আড়ালে আর একটি জগৎ আছে বলে আমার ধারণা। যা কাগজ-কলমের বাইরে। চিন্তা এবং সাধনার ফলই সৃষ্টি। ফকিরের মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমরা জানি না। কোন বিশেষ শক্তি ছাড়া কোনও মানুষ সং সেজে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না।'

সে যাই হোক, রহস্যের কূল-কিনারা না করতে পারলেও কিছু দিনের মধ্যেই সবার মন থেকে কেটে গেল দুর্ভাবনা। এদিকে জাকিনের ছুটিও প্রায় শেষের দিকে। একদিন জব্বার সাহেব বললেন, 'এই ফাঁকে ঢাকা থেকে ঘুরে আসলে কেমন হয়। বেড়ানোও হবে, তা ছাড়া জাকিন মায়ের জন্যে কিছু কেনাকাটাও করা যাবে।' জাকিনের মা বললেন, 'গেলে দু'একদিনের মধ্যেই চলো। জাকিনের কলেজ খুললে আর যাওয়া যাবে না।'

অতঃপর শুক্রবার সকালের গাড়িতেই যাত্রা করল তিনজন। বাস ফেরিতে ওঠার পর জাকিন লক্ষ করল সামনের সিটের একটি মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। জাকিন তাকাতেই মেয়েটি চোখ ফিরিয়ে নিল। মেয়েটির মাথায় ঘন কালো বাবরি চুল। সুন্দর চেহারা। চোখ দুটো বড় বড়। তবে চোখের গোলাকার অংশ কিছুটা বিড়ালের চোখের মত। গাড়ি আরিচা ঘাট পার হওয়ার পর আবারও মেয়েটির চোখে চোখ পড়ল জাকিনের। জাকিন ওর মাকে বলল, 'সামনের ওই সিঙ্গেল সিটের মেয়েটি বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছে।'

মা বললেন, 'তোর কলেজের কোন মেয়ে হতে পারে।'

'কিন্তু এমন কোন মেয়েকে দেখেছি বলে আমার মনে হয় না।'

তা হলে তোর মত দেখতে ওদের কোন মেয়ে আছে হয়তো।

বাস ঢাকা পৌঁছাবার পর একে একে যাত্রীরা নেমে গেল বাস থেকে। কিন্তু সেই মেয়েটিকে আর দেখা গেল না। জাকিন ওর মাকে বলল, 'সেই মেয়েটিকে তো দেখা যাচ্ছে না।' মা বললেন, 'বাস থেকে নেমে কেউ কি আর অপেক্ষা করে। হয়তো কোন গাড়িতে গিয়ে উঠেছে আবার।'

পরদিন জাকিনের মেঝো খালা সহ সবাই এলেন নিউ

মার্কেটে। একটা বড় জুয়েলারি দোকানে ঢুকে গহনা দেখছেন। এখানেও সেই মেয়েটি। জাকিনের চোখে চোখ পড়তেই মুখ ঘোরাল সে। মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে জাকিন বলল, 'মা, সেই মেয়েটি এতক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।'

'কোথায়?'

'ওই যে, দোকানের ওই মাথায়।'

'চল তো জিজ্ঞেস করি, সে এমন তাকায় কেন তোর দিকে।'

বেশ কয়েকজন মহিলাকে ডিঙিয়ে মা মেয়ে দু'জনই পৌঁছাল সেখানে। মা বললেন, 'কোন মেয়েটি।'

জাকিন তখন হতাশ চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বলল, 'এখানেই তো দাঁড়িয়ে ছিল। ওর পরনে ছিল লাল কামিজ সালোয়ার। কিন্তু এরই মধ্যে গেল কোথায়!'

মেঝো খালা বললেন, 'তোমরা কাকে খুঁজছ?'

জাকিনের মা বললেন, 'একটি মেয়ে। মনে হচ্ছে সে জাকিনের পেছনে আঠার মত লেগে আছে। ওর দিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকে।'

খালা বললেন, 'ছেলে তো আর নয়, মেয়ে। তো, থাক না চেয়ে, ক্ষতি কী।'

'তুই জানিস না, এর মধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে।'

'কী এমন কাণ্ড ঘটেছে?'

'পরে বলব। কেনাকাটা করলে জলদি করো। আমার ভাল লাগছে না।'

শেষ পর্যন্ত সবাইকে এক রকম তাড়িয়ে নিয়ে জাকিনের মা বাসায় চলে এলেন। রাতে জাকিনের ঘটনাগুলো বললেন ওর মা। গল্পে গল্পে নানা গল্প উঠে এল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। কিন্তু গভীর রাতে জাকিনের চিৎকারে ঘম ভেঙে গেল সবার।

জাকিন মাকে জড়িয়ে ধরে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁদছে। বাসার সবাই সান্ত্বনা দিয়ে বলল, কী হয়েছে খুলে বলো।' খালা বললেন, 'স্বপ্ন দেখেছ?' জাকিন মাথা নাড়ল। মা বললেন, 'কী স্বপ্ন দেখেছিস বল তো।'

জাকিন বলল, 'সেই মেয়েটি...'

'হ্যাঁ, মেয়েটি কী করেছে?'

'ওর হাতে একটা ছোট চাইনিজ কুড়াল। আমাকে মারতে আসছে, আমি ভয়ে দৌড়াচ্ছি।'

মেয়ের কথা শুনে সবাই কেমন হাঁ হয়ে গেল। ওর বাবা বললেন, 'লক্ষণ তো ভাল মনে হচ্ছে না। সেই ফকিরটা যে বলেছিল, খুনি, ও খুনি...। কিন্তু কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। অপরিচিত ওই মেয়েটা কেন একে খুন করতে আসবে।'

জাকিনের মেঝো খালু বরাবর আল্লাহওয়ালা মানুষ। পুরনো ঢাকায় তাঁর জুতার কারখানা আছে। তিনি বললেন, 'মনে হচ্ছে মেয়েটার উপর জিন-পরী আছর করেছে। ওকে এখুনি হুজুরের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। পুরানো ঢাকায় আমার জানাশোনা জবরদস্ত এক হুজুর আছেন। তাঁর কাছে গেলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। রাত হয়তো আর বেশি নেই। আযান পড়লে নামাজ পড়ে জাকিনকে নিয়ে আমরা চলে যাই সেখানে। এ-সব ব্যাপারে দেরি করলে ঝামেলা বাড়ে বৈ কমে না।'

হুজুরের দরবারে পৌঁছে একে একে সব ঘটনা খুলে বলা হলো হুজুরকে। হুজুর বললেন, 'যে মেয়েটিকে ও দেখতে পায় সে একটি মৃত মেয়ের আত্মা। ওই মেয়েটি হয়তো কারও হাতে খুন হয়েছে। এখন তার প্রেতাত্মা এভাবে ঘুরে বেড়ায়। কাউকে ভয় দেখিয়ে শান্তি পেতে চায়। ভয় নেই, আমি তদ্‌বির দিচ্ছি, আল্লাহ চাহে তো ভাল হয়ে যাবে।'

এ নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকলেও এর অধিক আর হুজুরের সাথে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া মানুষের ভিড়ও জমে উঠেছে। মেয়ের মনের ভয় দূর করার জন্য হুজুর ঝেড়ে দিলেন ওকে।

ঢাকা থেকে বাড়ি আসার পর জাকিনের বাবা বললেন, 'ওর আর ভূতুড়ে হোস্টেলে থেকে কাজ নেই। বাড়ি থেকেই কলেজ করুক। বাসে যাওয়া-আসা করবে। কতটুকুই বা পথ।' তারপর জাকিন বাসে চড়েই কলেজে যায় আসে। জাকিনের ঘটনাটা কলেজ কর্তৃপক্ষের কানে গেল। আশু ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ছাত্রীদের পুনঃ পুনঃ দাবীর মুখে একদিন হোস্টেলের পিছনের ঝোড়-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে দিলেন কর্তৃপক্ষ। আর কথা দিলেন অচিরেই নতুন হোস্টেলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে যাবে।

এভাবেই একটি বছর কেটে গেল। এর মধ্যে জাকিনের শাশুড়ি এসে ঘুরে গেছে দু'বার। তৌহিনের সাথে প্রায়ই মোবাইলে কথা হয় জাকিনের। আবার চিঠিপত্রও দেয়া-নেয়া চলে। কিন্তু জাকিনের এই সব ঘটনার এক বর্ণও কেউ প্রকাশ করেনি ওর শ্বশুর বাড়ির লোকদের কাছে। একদিন হঠাৎ ঢাকা থেকে খবর এল তৌহিন ঢাকা এসেছে। জাকিনকে তুলে নেয়ার ব্যাপার তৌহিনের বাবা লিখেছে দীর্ঘ এক চিঠি। আসছে ১৫ মাঘ আনুষ্ঠানিক ভাবে জাকিনকে তুলে নিয়ে যাবে। এই খবর আসার আগেও তৌহিনের সাথে মোবাইলে কথা হয়েছে জাকিনের। তৌহিন বলেছে, কবে যে দেশে ফিরব এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না। হয়তো আরও ছয় মাস দেরি হতে পারে। তুমি মন খারাপ কোরো না। ভাল থেকো ইত্যাদি।

কিন্তু জাকিন যখন আসল খবরটা জানতে পারল তখন ওর মনের মধ্যে যথেষ্ট পুলক ছড়াল বটে, তবে অতি আনন্দে অবুঝের

মত মাকে সে বলল, 'আরও নাকি ছয় মাস দেরি হবে? আজ সকালেই তো মোবাইলে বলল।' মা হেসে বললেন, 'দুষ্টুমি করে বলেছে।' তারপর থেকে জাকিনের মনের মধ্যে কেবল তৌহিনের চিন্তা। সেই সাথে শ্বশুর বাড়ির কথাও।

একদিন দু'দিন করতে করতে কেটে গেল এক মাস। এল জাকিনের শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার দিন। বরযাত্রীরা ওই দিন একটায় পৌঁছে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার চারটার দিকে বৌ নিয়ে রওনা হলো ঢাকার পথে। এর মধ্যে আর কখনও সেই মেয়ের প্রেতাত্মা জাকিনের সামনে আসেনি।

তৌহিনের বৌভাতের পর তৌহিনের বাবা বললেন, 'তোমরা কোথাও ঘুরে আস।'

তৌহিন বলল, 'কোথায় যাব?'

বাবা বললেন, কেন, কক্সেসবাজার যাও। এখন শীতের শেষ, গরমের শুরু। সমুদ্র সৈকতে বেড়াবার এই তো সময়।

তৌহিন কক্সেসবাজার যেতে রাজি নয়। ও বলল, 'তার চেয়ে বরং শ্রীলংকা যাওয়া যেতে পারে।'

বাবা বললেন, 'কেন, নিজের দেশকে আগে দেখো। সারা পৃথিবীর মানুষ আসছে এখানে। যথেষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত জায়গা। এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও উন্নত।'

উকিল সাহেবের কথায় বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সাথে জাকিনও ভোট দিল। যেতে হলে কক্সেসবাজারই যাওয়া ভাল। শেষে তৌহিন আর ভেটো না দিয়ে তখনই হানিমুনে যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলল।

কক্সেসবাজার যাওয়ার আগের দিন রাতে তৌহিনের চোখে আর ঘুম আসে না। জাকিন ঘুমিয়ে গেলে ও চুপি চুপি উঠে গেল ওদের চারতলার ছাদে। তখন অনেক রাত। ছাদের চারদিকে

বাউন্ডারি ওয়াল। তার উপর গ্রিল। পাশে চারদিকেই পাকা করে বেঞ্চ তৈরি করা। তৌহিন তার একটাতে বসল। মধ্য আকাশে তখন চাঁদ ভাসছে। কক্সেসবাজার যাওয়ার কথা উঠতেই পুরনো একটি স্মৃতি বার বার ভেসে উঠছে তার মনে। ও মনে মনে ভাবল, আবার সেই কক্সেসবাজার। ওই কক্সেসবাজারে গিয়েই তো...

ঠিক তখনই পানির পিপাসায় হঠাৎ জাকিনের ঘুম ভেঙে গেল। ও লক্ষ করল পাশে তৌহিন নেই। আলো জ্বেলে টেবিল থেকে পানি খেয়ে নিল। দরজা খোলা দেখে করিডর পার হয়ে ছাদের দরজার কাছে গিয়ে বলল, 'তুমি কি ছাদে?' তৌহিন জাকিনের কণ্ঠ শুনে দৌড়ে এল।

'তুমি আবার উঠে এলে কেন?'

'তুমি একা একা ছাদে কী করছ?'

'ঘুম আসছিল না।'

'এখন না ঘুমালে কাল জার্নি করবে কী করে। চলো ঘুমুবে।'

পরদিন প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় গুছিয়ে ওরা চেয়ার কোচে যাত্রা করল। যাত্রার আগে মা বলে দিলেন চিটাগাং গিয়ে তোর ছোট চাচার বাসায় এক রাত থেকে পরদিন সকাল সকাল ভাল কোনও গাড়িতে কক্সেসবাজার যাস। আর চিটাগাং পৌঁছেই রিং দিস। আর সব সময় যোগাযোগ রাখিস। তৌহিন বলেছিল, 'মা, তুমি চিন্তা কোরো না। এই কাজগুলো তোমার বৌমা ঠিক ঠিক করে যাবে।'

তৌহিন পরদিন চিটাগাং থেকে বেলা বারোটার মধ্যে কক্সেসবাজার গিয়ে পৌঁছাল। সিট নিল সমুদ্র পাড়ের একটি বিলাসবহুল হোটেলে। পাঁচতলার ব্যালকনি থেকে দেখা যায় অথই সমুদ্র। সবুজ ঝাউবন। কানে বাজতে থাকে বিশাল দরিয়ার

এক টানা গর্জন। সমুদ্র সৈকতে ফুঁসে আসা ঢেউয়ের মধ্যে স্নান করছে দেশী-বিদেশী পর্যটকেরা। অনেকে মুভি ক্যামেরা হাতে ঘুরছে যত্রতত্র। এখানে কত রকমের মানুষ যে আসে, কত রকম কাণ্ড কারখানা ঘটে তা বলে শেষ করা যায় না। ভাল মানুষের চোখের আড়াল দিয়ে খারাপ মানুষের আনাগোনা চলতে থাকে দিবা রাত্রি।

শুধু কি চোর ডাকাত আর ছিনতাইকারী? এসব ছাড়াও রয়েছে চোরাকারবারি, শিশু অপহরণকারী, হেরোইন, মদ-গাঁজার ক্রেতা-বিক্রেতা এবং মেয়েদের গুম-খুন আর পাচারকারী সংঘবদ্ধ দল। পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন ঘুরছে ডালে ডালে। কিন্তু দুষ্টু লোক ঘুরছে পাতায় পাতায়। কোনও ঘটনার হদিস মিলছে, আবার কোনও ঘটনা শেষ পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে স্রেফ দুর্ঘটনা।

সে যাই হোক, হোটেলে পৌঁছে ওরা লম্বা ঘুম দিয়ে বিকালে তৈরি হয়ে নিল। শহর ঘুরে কিছু কেনাকাটা করবে। সেই সাথে সূর্য অস্ত যাওয়াও দেখবে। সূর্যাস্তের দৃশ্য অবশ্য হোটেলের ব্যালকনি থেকেই দেখা যায়। তবু বেড়াতে আসা মানুষদের ভীড়ে বসে দেখার মজাটাই আলাদা।

হোটেলের রুম থেকে বেরিয়ে আসতেই পাশের রুমের খোলা দরজার দিকে চোখ গেল জাকিনের। একটা অপরূপ সুন্দরী মেয়ের সাথে চোখাচোখি হলো ওর। মেয়েটি মিষ্টি হেসে দরজার কাছে এসে বলল, 'কোথাও যাচ্ছেন বুঝি?'

তৌহিন ও জাকিন থমকে দাঁড়াল। জাকিন বলল, 'একটু বাইরে যাচ্ছি। আপনারা কি আজই এসেছেন?'

মেয়েটি বলল, 'গত কাল। বাইরে থেকে ফিরে এসে আমার এখানে আসবেন কিন্তু।' জাকিনের খুব ভাল লাগল মেয়েটিকে।

তৌহিনেরও ভাল লাগল।

ওরা রিকশা করে ঘোরাফেরা করল কাছে-কিনারের দোকানগুলোতে। তারপর হাজার হাজার দর্শকদের সঙ্গে দেখল সূর্যাস্তের মোহময় দৃশ্য। হোটেলে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল। যে কারণে পাশের রুমে আর নক না করে ভাবল, কাল সকালে না হয় ডেকে এক সঙ্গে চা খাওয়া যাবে।

কিন্তু ঘুম ভাঙতে ভাঙতে বেলা নয়টা বেজে গেল জাকিনের। হাতমুখ ধুয়ে একটু ফ্রেস হয়ে নক করল পাশের রুমে। মেয়েটি দরজা খুলে বলল, 'আসেন, আমি আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি।'

জাকিন বলল, 'আপনার সাহেব উঠেছেন?'

মেয়েটি হাসল। বলল, 'ওর কথা আর বলবেন না। ওর কি রেস্ট নেয়ার সময় আছে। কেবল কাজের পিছনে ছুটোছুটি। সকালে উঠেই জরুরি একটা কাজে ঢাকা চলে গেল। ওই পথে খুলনাও চলে যেতে পারে। ফিরতে সপ্তাহ খানেক তো লাগবেই।'

'আপনি এখানে একাই থাকবেন?'

'হ্যাঁ, একাই থাকব। ও ফিরে এলে, এখানকার কাজ সেরে রাজশাহী চলে যাব।'

'ও! তা হলে তো জমিয়ে গল্প করা যাবে।'

'নিশ্চয়ই। আর আজ আমার এখানেই ব্রেকফাস্ট করতে হবে কিন্তু। তৌহিনকেও ডাকুন।'

'আপনি ওর নাম জানলেন কী করে। আগে থেকে চেনেন নাকি?'

'কী যে বলেন। মনে হয় নীচে অফিস থেকে শুনেছি। হঠাৎ মুখে চলে এল। মাইন্ড করলেন?'

'এতে মাইন্ড করার কী আছে।'

তৌহিন এলে পর ওরা খেতে শুরু করল। কিন্তু মেয়েটি খাচ্ছে না, সে ওদের খাওয়া দেখছে। জাকিন বলল, কী ব্যাপার, আপনি তো খাচ্ছেন না।'

মেয়েটি বলল, 'আমি সকালে কিছু খাই না। তা ছাড়া ডাক্তারের মানা আছে।'

তৌহিন মুচকি হাসল। বলল, আপনারা অর্থাৎ মেয়েরা কত কী যে জানেন।'

মেয়েটি বলল, 'মেয়েদের অনেক দোষ, ছেলেদের দোষ ধরতে নেই। সে যাক, টেবিলের সব খাবার কিন্তু শেষ করতে হবে।'

অদ্ভুত সব খাবার। সে সব কক্সেসবাজারের বড় কোন হোটেলে পাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে ভাবল তৌহিন। গরম গরম এমন সব শাহী খাবার খেতে খেতে তৌহিন ভাবতে লাগল, আমি তো অনেকবার এই কক্সেসবাজারে এসেছি। অনেক বড় বড় মানুষের সঙ্গে বড় বড় হোটেলে খেয়েছি, কিন্তু এমন খাবার তো খাইনি কখনও!

খাওয়া শেষ হলে মেয়েটি বলল, 'আজ সূর্যাস্ত দেখার পর একটু বেড়াব। অবশ্যই আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন।'

জাকিন বলল, 'কোথায়?'

'কেন, সবুজ ঝাউবনে। রাতে চাঁদ উঠবে, সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাসে ঝাউ বনে হাঁটতে দারুণ লাগবে।'

'তাই তো। এমন করে তো আমি ভাবিনি।'

কিন্তু জাকিন লক্ষ করল তৌহিন কিছু বলছে না। জাকিন তখন তৌহিনের একটা হাত ধরে বলল, 'কই, তুমি তো কিছুই বলছ না। সন্ধ্যার পর কিন্তু আমরা ঝাউবনে বেড়াতে যাব।'

তৌহিন বলল, 'রাতের বেলা ওসব জায়গা না যাওয়াই ভাল।'

মেয়েটি বলল, 'কেন? আমি তো অনেক বার গিয়েছি। বালুর ওপর দিয়ে ছুটেছি।'

'না, মানে, বাজে লোকজন উৎপাত করতে পারে, তাই...।'

'পুরুষ মানুষের অত ভয় করলে চলে! তা ছাড়া শুধু কি আমরাই যাব? আমাদের মত আরও অনেক মানুষ যাবে।'

কথাগুলো বলার মধ্যে মেয়েটির চোখে-মুখে কী যে চুম্বকের টান, তা থেকে নিজেকে দূরে ঠেলতে পারল না তৌহিন। সেও মিষ্টি হেসে বলল, 'আপনার যখন এতটাই ইচ্ছে তখন না গিয়ে আর কী করা।'

কিন্তু তৌহিনের মনের মধ্যে বার বার ভেসে উঠছে মৌমির মুখ। ওই ঝাউবনে মৌমির করুণ মৃত্যু তৌহিনকে আগে যতটা বিচলিত না করেছে, এখন সে সব ভাবতে গেলে কেমন শিউরে ওঠে ও। তবু সব ভুলে শুধু জাকিনের জন্যই সূর্য ডোবার আগেই হোটেল থেকে নেমে গেল ওরা তিন জন।

বিশাল সমুদ্রের মাঝে কুসুম রাঙা গোলাকার সূর্যটা বলের মত ভাসছে। হাজার হাজার দর্শক পলকহীন চেয়ে আছে। হঠাৎ সূর্যটা দিগন্ত জোড়া সমতল পানির উপর একটু নেচে উঠেই টুপ করে ডুবে গেল সাগর গর্ভে। উপরের আকাশটা তখনও রক্তিম আভা ছড়িয়ে ম্লান মুখে স্তব্ধ বধির। ঠিক তখনই মধ্য আকাশে আবার জ্বলজ্বলে আলোর রোশনাই ঢেলে হেসে উঠল চাঁদ। মুহূর্তে আবার প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠল সাগর কূলের জনপদ। কূলে গড়িয়ে আসার ঢেউগুলো চাঁদের আলোয় মনে হতে লাগল যেন উত্তাপে গলে যাওয়া তরল চাঁদনি।

ঝাউবনে হাঁটছে মানুষ। কেউ বা ছুটছে। তৌহিন, জাকিন ও সুন্দরী মেয়েটিও হাঁটছে। গল্পে গল্পে এগিয়ে গেল অনেক দূর। হঠাৎ মেয়েটি তৌহিনের হাত ধরে ছুটতে শুরু করল। ছুটতে

ছুটতে চলে গেল ঝাউবনের গভীরে। তৌহিন হঠাৎ খেয়াল করল তার হাত ধরা মেয়েটি তো সেই মেয়েটি নয়। নির্জনে থমকে দাঁড়াল মেয়েটি। তৌহিন দেখল এ মেয়েটির পরনে সাদা শাড়ি, মাথায় বাবরি চুল। জোছনায় মেয়েটির মুখের দিকে তাকাতেই তৌহিনের সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। অস্পষ্ট সুরে বলল, 'মৌমি, তুমি! আমি জানি তুমি বেঁচে নেই, তুমি মৌমির প্রেতাত্মা।'

যেন কঠিন ধাতুর তৈরি শক্ত চোয়াল বাঁকিয়ে মৌমি বলল, 'হ্যাঁ, আমি মৌমির প্রেতাত্মা। এখন আমি অনন্তকাল ছায়ার মত বেঁচে থাকব। তুমি আমাকে খুন করে আমার রক্তাক্ত দেহটাকে এই ঝাউবনে বালির নীচে পুঁতে দিয়েছিলে। আমি ছায়ার মত বালির তলা থেকে আবার উঠে এসেছি। শুধু প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।'

তারপর মৌমির প্রেতাত্মা একখানা রক্তমাখা কুড়াল উঁচু করে বলল, 'এই কুড়াল তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে সমুদ্রে মধ্যে। আমি আবার সে কুড়াল তুলে এনে রেখেছি।' এ সব কথা বলতে বলতে এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল মৌমি।

ভয়ে দিশাহারা তৌহিন পাগলের মত চিৎকার দিতে দিতে বলল, 'মৌমি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি আমাকে খুন কোরো না।'

এদিকে জাকিন ওদের হারিয়ে ভয়ে ভয়ে কেবল সামনে দৌড়াচ্ছে। হঠাৎ তৌহিনের কণ্ঠ তার কানে এল। শব্দ লক্ষ্য করে সে ছুটল সেই দিকে। মৌমির প্রেতাত্মা তখন প্রতিশোধের আগুনে দাঁত-মুখ ভেংচি দিয়ে তৌহিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তৌহিন বালুর উপর বসে হাতজোড় করে কেঁদে উঠল। 'মৌমি, তুমি আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও। আমার জন্যে জাকিনের জীবনটা তুমি

নষ্ট করে দিও না।'

সেই মুহূর্তে জাকিন গিয়ে সামনে দাঁড়াল। ও দেখল, এ তো সেই মেয়ে, যে তাকে এত দিন ছায়ার মত অনুসরণ করে আসছে। জাকিনও হাতজোড় করে বলল, 'তুমি যদি তৌহিনকে হত্যা করো, তার আগে আমাকে হত্যা করতে হবে। ও মরে গেলে আমার বেঁচে থেকে লাভ কী।'

মৌমির প্রেতাত্মা বলল, 'আমার কী অপরাধ ছিল? আমার বাবা-মায়ের কী অপরাধ ছিল? আজও পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি নিজের হাতে খুন করে আমার হত্যার প্রতিশোধ নেব।'

জাকিন পাগলের মত চিৎকার করে বলল, 'দোহাই তোমার, তুমি ওকে মেরো না। আমি জানি না তৌহিন কী অপরাধ করেছে। কিন্তু এখন সে ভাল হয়ে গেছে। তুমি তাকে ক্ষমা করো। মনে করো আমি তোমার ছোট বোন। তুমি কি তোমার ছোট বোনের জীবনটা নষ্ট করে দেবে?'

ওদের চিৎকার শুনে সিকিউরিটি পুলিশের সাথে অনেক দর্শনার্থীও ছুটে গেল সেখানে। ওদের পৌঁছানোর আগেই মৌমির প্রেতাত্মা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল কুড়ালখানা। তারপর ওদের দু'জনার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'পালা, পালা এখান থেকে। আর কোনদিন এই সমুদ্র সৈকতে তোকে যেন আমি না দেখি!' এ-কথা বলেই উধাও হয়ে গেল মৌমির প্রেতাত্মা।

তখন ছুটে আসা লোকজন বালির উপর ওদের পড়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে?'

তৌহিন বলল, 'একটা ভয়ঙ্কর লোক কুড়াল হাতে আমাদের খুন করতে চেয়েছিল। আপনারা দৌড়ে আসতেই দ্রুত কোথায় যেন পালিয়ে গেল।'

পুলিশ বলল, 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন। আর কখনও এত দূরে এই নির্জন এলাকায় আসবেন না।'

নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে, ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ওরা ফিরে এল হোটেলে। এসেই দেখল, সেই সুন্দরী মেয়েটার ঘরে তালা ঝুলছে। তখনই হোটেলের বয়কে ডেকে তৌহিন বলল, 'এই রুমে যে ছিল সে কোথায়?'

বয় বলল, 'মৌমি মেডাম একটু আগেই হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কেন, আপনাদের সাথে কোন লেনদেন ছিল নাকি?'

জাকিন বলল, 'ছিল, কিন্তু আজই তা মিটমাট হয়ে গেছে।' পরদিন সকালেই তৌহিন আর জাকিন ফিরে এল ঢাকায়।

দেলোয়ার হোসেন

বাজনা

কিছু কিছু মানুষ জন্মমুহূর্তেই কয়েকগুণ বেশি আদিপাপ নিয়ে জন্মায়। সেই আদিপাপের তাড়নায় কেউ ঘরসংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশে– সন্ন্যাসী হয়। কেউ বা ঢোলের বাড়ি পড়লেই দোকানপাট শিকেয় তুলে ঢোলের বোলে তাল দিতে লেগে যায়।

জন্মসূত্রে আদিপাপ পেয়েছি। ও এড়ানো যায় না। আদিপাপের তাড়নায় আমার বয়সী ছেলেদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি দুরন্ত আমি। তবে দুরন্তপনার তেমন একটা সুযোগ পাই না। যা পাই তার অধিকাংশই স্কুলে প্রয়োগ করি। বাড়ির পাড়ায় প্রয়োগের সুযোগ কম। আমাদের বাড়ি একটা ফাঁকা জায়গায়। বলতে গেলে জঙ্গলের মধ্যেই আমাদের বাড়িটা। আশপাশে আমাদের মত আরও কয়েকটা হিন্দুবাড়ি আছে। এই জঙ্গলের মাঝামাঝি একটা আধভাঙা কাঁচামাটির অব্যবহৃত মন্দিরের সামনের ফাঁকা জায়গায় দেল পুজোর উৎসব হয়। বড় একটা প্রাচীন উঁচু খেজুর গাছ আছে যাতে দেল পুজোর দিনে গাছের উপর 'খেজুর ভাঙা' নাচ হয়। পুজোর কারণেই এদিকটাতে কিছু বসতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে।

দুরন্তদের ভয়-ডর বোধ হয় কম থাকে। ওই ছোট্ট বয়সে ভয়

কী জিনিস তেমন একটা টের পেতাম না। ক্লাস ফোরে পড়ি, অথচ একা একা লিজের ছোট্ট টোঙ কুঁড়েতে একটা টর্চ লাইট নিয়ে রাতে মাছ পাহারা দিয়েছি। লিজটা অবশ্য আমাদের বাড়ির পাশেই। রাতে দল বেঁধে মাছের ঝাঁক পানির উজানে উঠে আসার শব্দ করলে টর্চ জ্বেলে দেখেছি মাছ চোরেরা এসেছে কিনা। তা হলে বাড়িতে যেয়ে বাবাকে ডেকে আনতে হবে।

দেল পুজো বা চড়ক পুজোর দিনে খুব মজা হয়। তখন আমাদের এই জঙলামত জায়গার খুব দাম উঠে যায়। চৈত্রের শেষের দিন চড়ক পুজো হয়। দূরদূরান্ত থেকে চড়ক নাচের দল গ্রামে আসে। বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে দেল নাচ নেচে ধামাভর্তি চাল, চিড়া, মুড়ি জোগাড় করে।

চড়কের মেলা বসে। একদিনই। মেলায় হরেক জিনিস ওঠে। সব আমাদের ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য। চিনি দিয়ে তৈরি হরেক সাদা পুতুল বিক্রি হয়। খেতে যা মিষ্টি, যেন গুড়!

হয় চড়ক নাচ। নাচের নানা ধরন আছে। ফুল তোলা নাচ। দেল নাচ। দলবদ্ধ ভাবে ঝুমুর নাচ। একক নাচ। আর তার সাথে সে কী বাজনা। খোল-করতাল-ঢোলের বাড়িতে মাতাল করা বাজনা। শরীর ঝিনঝিন করে ওঠে। অদ্ভুত এক মাদকতা সে বাজনায়।

তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয় খেজুর ভাঙা নাচ এবং তার বাজনা। কাঁটাভর্তি দীর্ঘদিনের অযত্নে লালিত তিনমানুষ উঁচু খেজুর গাছের একেবারে মাথায় উঠে এই নাচ হয়। নাচ হয় খেজুর গাছের ওই ভয়াবহ লম্বা লম্বা সুতীক্ষ্ণ কাঁটার উপর। সে নাচও মাতাল করা নাচ। নীচে মাতাল করা দ্রুত লয়ের বাজনা। যে নাচে তাকে তখন আর রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয় না। মনে হয় অন্যজগতের কেউ। যার পায়ের তলা কাঁটাগুলো তুলো

হয়ে গেছে।

অনেক সময় বড়সড় খেজুর গাছ হলে অতিদক্ষ দুজন নাচিয়ে পর্যন্ত উঠে যায়। তবে খেজুর গাছের মাথা দুজনের শরীর দোলানোর জন্য প্রশস্ত নয় বলেই প্রায় সব জায়গায় একজনই নাচে।

আমাদের চড়ক পুজোর দিনে এবারে দুজনে খেজুর ভাঙা নাচ নাচে। একজন আমাদের মত ছোট মানুষ। বাবা আর ছেলে। বাবা তার কাজ ছেলেকে শিখিয়েছে। বাবার সাথে ছেলেটা তরতর করে কাঁটা গাছে উঠে যায়। আমরা দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর শুরু হয় নীচ থেকে মাতাল বাজনা। উপরে বাপ-বেটার দ্বৈত নাচ। সে নাচ যেন নাচ নয়। খেজুর গাছের মাথায় ঝড় ওঠে।

সন্ধের পর পর কালবোশেখীর ঝড় উঠলে চড়কের মেলা মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়। এ তো আর আহামরি কোনও মেলা নয়। সব বিক্রেতাই আশপাশের গ্রামের। ছোট ছোট ডালা-ডালিতে করে বিক্রির জিনিস নিয়ে এসেছিল। সেগুলো মাথায় নিয়ে প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে নিজ গ্রামের পথ ধরে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির আগে নিরাপদে পৌঁছাতে চায়। চড়কের দল তাদের মান্যি নিয়ে আগেই অন্য দিকে চলে গেছে। আর আমাদের ছোটদের জন্য রেখে গেছে দীর্ঘশ্বাস। ওই ছোট ছেলেটার মত আমরাও যদি হতে পারতাম। ওর কত মজা। ঘুরে ঘুরে নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। স্কুলে যেতে হয় না। কত লোকের হাততালি পায় ও। সাথে টাকাও।

রাতে শুয়ে শুয়ে ছেলেটার কথা ভাবছি। বাইরে কালবোশেখীর তাণ্ডবনৃত্য চলছে। আমাদের ঘরের টিনের চালে ঝড়ের সে কী দাপট আর শব্দ। মনে হয় টিনের চালই উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

বাইরে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। ঝড়ের সাথে বিদ্যুৎচমক। তারপরই কড় কড় শব্দে বাজ পড়ার শব্দ।

গুটিসুটি মেরে শুয়েছি। বালিশের নীচে নতুন বলাকা ব্লেড। মেলা থেকে কিনেছিলাম। সকালে লাগবে। না, আম ছিলতে নয়। আধমরা বকগুলোর গলায় পোচ দিতে। বক পেতে হলে সবার আগে আগেই উঠতে হবে। মুসলমানদের সকালের আজান পড়ার আগে উঠতে পারলে ভাল হয়। না হলে লস্কর বাড়ির ছেলেরা ঝড়ে পড়া বক কুড়িয়ে নিয়ে যাবে।

আজানের আগেই উঠব বলে চোখ-কান বুজে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। ঝড়ের বেগ বাড়ছে। বাড়ুক। আমার ঘুমানো দরকার। মাকে বলে দিয়েছি ডেকে দিতে। বলেছে ডেকে দেবে। কিন্তু মায়ের কথায় বিশ্বাস নেই। হয়তো আমাকে মড়ার মত ঘুমাতে দেখে মায়া লেগে যাবে, আর ডাকবে না। আমার যে কত ক্ষতি হয়ে যাবে তা তো বুঝবে না। মায়েরা যে কী!

বকের চিন্তায় বোধহয় ভাল ঘুমই হয়নি। ঘুমের মধ্যেই কয়েকবার আজানের শব্দ শুনেছি। ঘুম থেকে জেগেও আজানের শব্দ শুনতে পেলাম। নদীর ওপারে একটা মসজিদ আছে। তাতে মাইক লাগানো। তা থেকে বুড়োগলার আজানের শব্দ ভেসে আসছে।

পড়িমরি করে উঠে পড়লাম। সময় নেই। লস্কর বাড়ির ছেলেরা আগেই উঠে চলে গেছে কিনা কে জানে। ঝড়ের বাড়ি খেয়ে ফাঁকা জায়গায় বক বেশি পড়ে থাকে। সে হিসাবে চড়কের মাঠের দিকেই যাওয়া উচিত। বক তো সব ওর পাশের গাছগুলোতে থাকে দেখেছি।

খুব সাবধানে কাঠের দরজায় কোনওরকম শব্দ না করে বেরিয়ে পড়লাম। দরজার শব্দ শুনে আমার জ্যাঠার ছেলেরা জেগে

যেতে পারে। জেগে গেলে ওরাও বেরিয়ে পড়বে। ভাগে কম পড়বে আমার।

বাইরে এখনও অন্ধকার। আজান শেষ হয়ে গেছে। সকালের আজানে কি বাইরে এত অন্ধকার থাকে? সকালের কোনও আভাই কি দেখা যায় না? ঝড় এক্কেবারে থেমে গেছে। কিছুটা বাতাস আছে। কালো কালো গাছের পাতা দুলছে তাতে।

হাফ প্যান্টের পকেটে ব্লেডটা নিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে লিজ পাহারা দেয়ার টর্চলাইটটাও আনলে হত। এত অন্ধকার থাকবে কে জানত। সকালের আজান সকালে দেয় বলেই তো শুনেছি। এরকম মাঝরাতে দেয় নাকি!

আস্তে আস্তে হেঁটে চড়কের মাঠের দিকে এগুতে থাকলাম। ভয়ে নয়, অন্ধকারে আমার গতি কমে গেছে। এই অন্ধকারে অবশ্য বক খুঁজে পাওয়া খুব একটা সমস্যা নয়। কালো অন্ধকারের বুকে সাদা বক সহজে চোখে পড়বে।

চড়কের মাঠ তো, পথ খারাপ না। বিলের মত কিছুটা জায়গা পার হতে হয়। তারপর আবার কারা যেন মাদুর বোনা মেলে লাগিয়ে রেখেছে। কাকাদের খেত নাকি? উল্টোদিকে যাচ্ছি না তো? কাকাদের খেত এদিকে আসবে কীভাবে?

মাথা তুলে তাকালাম। ওই তো সেই মন্দিরের ভাঙাবাড়ি। খেজুর ভাঙা নাচের খেজুর গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা জায়গায় বলে চারদিকে কেমন একটা অদ্ভুত আলো আলো মত আছে। সকালের আলো এরকম হয় নাকি? এত সকালে তো উঠিনি কখনও।

সামনে হাত চারেকের মত নালা পড়ল। হাঁটু পানি। উহ, পানি কী ঠাণ্ডা! আচ্ছা, দিনের বেলায় কোন পথে আসতাম? পানি পার হতে হয়নি তো কখনও। যাকগে যাক। জায়গায় পৌঁছানো

নিয়ে কথা। লিজ ঘেরের দিকটাতে ঝড়ে পড়া বক খুঁজতে যাওয়া যেত। কিন্তু ওদিকে গেলে আবার মাছ চোর বলে তাড়া করতে পারে। চড়কের মাঠই ভাল। যে কয়টা পাওয়া যায় তাতেই চলবে।

কেমন যেন ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে আজানই সব গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছে। বুড়ো মুয়াজ্জিন ব্যাটা কি ভুল করে মাঝরাতে সকালের আজান দিয়ে বসেছে নাকি? তা হলে তো বিপদ। বুড়োর ঘড়িটড়ি নেই। ঘড়ি দেখতেও জানে না। আন্দাজ করে আজান দেয়। থাকে মসজিদে। হয়তো মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেছে। আজান দিয়ে বসে আছে। তা হলে আমার খবর আছে। এই মাঝরাতে জঙলাজায়গায় ঘুরে মরতে হবে। আলেয়ার আলো পিছে লাগলেই হয়েছে। পথও যে ওলোটপালোট করে ফেলেছি বেশ বুঝতে পারছি। এরপরে যদি আলেয়ার পাল্লায় পড়ি তা হলে 'ঝড়ে বক পড়ে ফকিরের কেরামতি বাড়ে' বের হয়ে যাবে আমার।

ভগবানের নাম নিয়ে চড়কের মাঠের দিকে চলে এলাম। মাঠ বলে যে সুন্দর ঘাসে ছাওয়া পরিচ্ছন্ন জায়গা তা কিন্তু নয়। দিনের বেলা মেলা-টেলা হলেও মাঠের জঙলা ভাবটা যায়নি। একটা সাদা কিছু পড়ে থাকতে দেখে পায়ে পায়ে হেঁটে সেটার কাছে এলাম। সাদা কাগজের ঠোঙা। ঝড় উড়িয়ে-টুড়িয়ে এনে আবার এখানেই ফেলেছে। গাছটাছ একটু যেদিকে সেদিকেই প্রথম একটা পেলাম। মরে শক্ত হয়ে আছে। ঝড়ের ঝাপটা আর গাছের বাড়িতেই ওর জীবনলীলা শেষ। তবুও ওটা হাতে নিলাম। মরা জিনিস খাওয়া না গেলেও দেখাতে পারব। খুব বেশি পেয়ে গেলে, হাতে জায়গা না থাকলে না হয় ফেলে দেয়া যাবে। মন্দিরের আধভাঙা বারান্দার নীচে খোঁড়াতে থাকা একটা বক পেলাম। এটা

বেশ আছে। শুধু ডানা ভেঙে গেছে। উড়তে পারছে না। এর গলা না কাটলেও চলবে। বাড়িতে দুদিন রেখে খাওয়া যাবে। যেগুলো মরো মরো অবস্থা হয় ওগুলো বলি দিতে হয়।

মরো মরো অবস্থার একটা বক পেলাম। বড় খেজুর গাছটার কাছেই। এটার এখন তখন অবস্থা। বাড়ি পর্যন্ত নেয়ার আগেই ওর কম্মো কাবার। অগত্যা বাকি বক দুটো নামিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে ব্লেড বের করে বকটার গলায় পোঁচ দিতে যাব তখনই শব্দটা শুনতে পেলাম।

মনোযোগটা বকের গলায় ছিল বলে শব্দটা বুঝতে পারিনি। এবার মাথা উঁচু করে শব্দটা শোনার চেষ্টা করলাম। শব্দটা খেজুর ভাঙা নাচের খেজুর গাছের দিক থেকেই আসছে। বাজনার শব্দ। খেজুর ভাঙা নাচের যে বাজনা।

বক বলি দেয়া হলো না। ব্লেডটা শক্ত করে হাতে ধরা। বক পড়ে গেছে হাত থেকে। বাজনার শব্দ বাড়ছে। সেই মাতাল করা বাজনা।

ভয়ে শক্ত হয়ে গেছি। নড়ার শক্তি নেই এমন অবস্থা।

আশ্চর্যের ব্যাপার, জন্মের আদিপাপের কারণেই কিনা জানি না, বাজনার শব্দ শরীরে যেন ঝিমঝিমিয়ে উঠল। বাজনার শব্দ এখন যেন আসছে চারদিক থেকে। আসছে খেজুর গাছের গোড়া থেকে আসছে ভাঙা মন্দিরের ভেতরের অন্ধকার থেকে। এমনকী একবার মনে হলো বাজনার শব্দ অনেক উঁচু থেকে, খেজুর গাছের মাথা থেকে আসছে।

ভয় বেশি পেলে বোধহয় মানুষ খেপার মত হয়ে যায়। আমারও তখন ওই অবস্থা। দৌড়ে পালিয়ে বাড়ির দিকে আসব, সেটা না করে খেজুর গাছের আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। কেন গেলাম জানি না। গেলাম এটুকু জানি। খেজুর গাছের মাথায়

তাকালাম। স্পষ্ট দেখলাম ওখানে দুজন মানুষ নাচছে। খেজুর ভাঙা নাচ। একজন আমার মত ছোট। আরেকজন বড়। ঠিক যেমনটি দেখেছি আজ দুপুরে। শুধু পার্থক্য হলো তখন দেখেছিলাম আসল মানুষ। আর এখন দেখছি কালো মানুষ বা মানুষের ছায়া। মাতালের মত ছোট এবং বড় ছায়া বা বাপ-বেটা ছায়া নেচে চলেছে। আর চারদিকের অদৃশ্য থেকে ভেসে আসছে বাজনা। ঢাকের বাজনা।

হঠাৎ করে ইলেকট্রিক সুইচ খুলে নেয়ার মত সব বাজনা একসাথে বন্ধ হয়ে গেল। সব শব্দও। সে এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। বাতাসের শব্দ পর্যন্ত নেই। বাজনার জগতের চেয়ে শব্দহীন জগৎ আরও ভয়াবহ।

বাজনা কেন বন্ধ হয়ে গেল খুঁজতে তাকালাম গাছের দিকে। দেখি গাছের মাথার নাচও থেমে গেছে। আর ছোটবড় দুই ছায়ামূর্তি গাছ বেয়ে তরতর করে নেমে আসছে নীচের দিকে। ওদের নামার ভঙ্গি দেখেই মনে হলো ওরা আমার দিকেই আসছে।

ভয়ে জমে পাথর হয়ে গেছি। নড়তে পারছি না। মনে হচ্ছে পায়ের সাথে কয়েক মণ পাথর বাঁধা।

আবার নড়ার চেষ্টা করলাম। এ যেন শেষ চেষ্টা। এবারের চেষ্টায় কাজ হলো। নড়তে পারছি দেখে দৌড়াতে শুরু করলাম। বক টক ফেলেই। নিজে বাঁচলে ওরকম ঝড়ে পড়া বক অনেক পাওয়া যাবে।

দৌড়াচ্ছি যাকে বলে একেবারে পড়িমরি করেই। সেই নালায় পড়ে আধচোবানি খেয়ে উঠে আবার দৌড়াতে থাকলাম। পিছনে তাকাবার সাহস নেই। দৌড়াতে দৌড়াতে লিজঘেরের পানির মধ্যে গিয়ে পড়লাম। ঘেরের অল্প পানির মধ্য দিয়ে ছপছপ শব্দ

তুলে এক রকম হামাগুড়ির মত করে দৌড়াতে থাকলাম। প্রাণ বাঁচানো বলে কথা!

হঠাৎ তীব্র চোখ ধাঁধানো আলো এসে পড়ল আমার উপরে।

তিন ব্যাটারির টর্চের আলো।

ঘেরের পাহারাদার।

আমাকে ভয়ে কাঁপতে দেখে এবং চিনতে পেরে কোলে করে বাড়িতে নিয়ে এল। ঘেরের পানিতে ভিজে একাকার। ভয়ে শীতে কেঁপে জ্বর এসে গেল।

মা-বাবা-জেঠা-কাকা সবাই আমার চারদিকে। কী হয়েছে জানতে চায়। আমি কোনও কথা বলি না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি।

নানাজন নানা মন্তব্য করে। ভূতে নিয়ে গেছে। নিশায় ধরেছিল। ভূতে পেয়েছে। শুধু মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে।

তার কিছুক্ষণ পরে ফজরের আজান পড়ে। আজানের আগে বুড়ো ভুল স্বীকার করে। সে ভুল করে ঘুম থেকে উঠে রাত তিনটার দিকে আজান দিয়ে ফেলেছিল। এখন সে দিচ্ছে সকালের আজান। ফজরের আজান।

সেই যে বাজনার শব্দ আর নাচ আমার মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে তার পর থেকে আমি ভয় নিয়ে আর দশটা সাধারণ মানুষের মত বড় হয়ে উঠছি।

ভয়ডর না থাকাটাও ভয়ের ব্যাপার!

প্রিন্স আশরাফ

নেকড়ে

আড়ষ্ট হয়ে গেল পা। লটপটে কানদুটো হঠাৎ টান টান হয়ে সাপটে গেছে মাথার পেছনে। গর গর করে ডেকে উঠল বাস্টার। অবাক চোখে ওকে দেখছে তানা। দশ ফুট দূরে রাস্তার ঠিক মাঝখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে নতুন ছেলেটা। পা টিপে টিপে চুপিসারে কখন যে এসে দাঁড়িয়েছে, জানতে পারেনি তানা। বাস্টারের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখতে পেল হ্যাংলা ছেলেটাকে। গর্জে উঠল বাস্টার।

রুপো বাঁধানো শিকারী ছুরি দিয়ে ছড়ি ছিলছিল তানা। 'একটু দাঁড়াও' ফার্মহাউসের সামনে ভিজে ঘাসে বসে। থেমে গেল ওর হাত। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল প্রিয় কুকুর ওল্ড বাস্টারের দিকে। মাথা ঝুঁকে তেরছা চাহনি মেলে নতুন ছেলেটাকে দেখছে বাস্টার। দাঁতের ওপর হিংস্রভাবে গুটিয়ে গেছে ঠোঁট। পাছে ছেলেটাকে তেড়ে যায় ভয়ে কুকুরটার বকলস চেপে ধরতে গেল, গ্যাঁক করে উঠল বিচ্ছিরি শব্দে। পিছিয়ে এল তানা। এক'পা দূরে সরে গিয়ে কেঁউ কেঁউ করে উঠল বাস্টার। পেছনের দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। বিশ ফুট দূরে গিয়ে থামল। চুপ। মুখে যেন চাবি এঁটে দিয়েছে কেউ। ভয়তরাসে চাহনি। আড়চোখে নয়া ছেলেটার পানে চেয়ে আছে

নিষ্পলক। জ্বলে উঠল বুঝি চোখ। তারপরেই ভোঁ দৌড় দিল খামার বাড়ির কোণ ঘুরে।

আশ্চর্য! ভালুক দেখেও ডরায় না যে, সে–।

ছেলেটার দিকে চাইল তানা। রেগে টং হয়ে গেছে ও। রঙ শ্যামলা। পাতলা ছিপছিপে। অদ্ভুত মায়াময় চোখ। শক্ত, কোঁকড়ানো চুল, লম্বা, করোটিতে সেঁটে রয়েছে টুপির মত।

কোলের ওপর থেকে কাঠের কুচো ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল তানা। 'অ্যাই, কী করলে তুমি ওকে?' রাগে ফেটে পড়ল ও।

ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটা, চোখে ভয়ের ছায়া।

'কথা বলছ না যে?'

'কুকুররা আমাকে দু-চোখে দেখতে পারে না।'

'কেন?'

'ভয় পায়।'

'ইস্। ভয় না ছাই, অন্য কিছু দেখে ভয় পেয়েছে।'

'আমাকেই ভয় পেয়েছে।'

বাড়ির কোণে মুখ বাড়িয়ে তখনও চেয়ে আছে বাস্টার। ছেলেটার লাজুক দৃষ্টি পড়তেই চাবুক খেল যেন। স্যাৎ করে মুখ সরিয়েই হাওয়া। এক সেকেন্ড পর খস্ খস্ শব্দ কানে এল তানার। পেছনের মাঠে জমে আছে খড়। তার ওপর দিয়ে টেনে দৌড় দিচ্ছে ওল্ড বাস্টার।

'কে তুমি?'

'শাওন।'

খানিকক্ষণ চেয়ে রইল তানা। দু'পা এগিয়ে এল শাওন। ওকে কেয়ার না করে ধপ্পাস্ করে বসে পড়ল তানা আগের জায়গাটিতে। মুখটা গম্ভীর।

'কী করছ?' নীরবতা ভাঙল ছেলেটা।

'মাছ ধরার ছিপ তৈরি করছি।'

'তোমার নাম?'

'তানা, তানা আমার নাম। আর আব্বু আমাকে তানু বলে ডাকে, বুঝলে।'

এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কী ছাই-পাঁশ বুঝল ছেলেটা কে জানে। পায়ে পায়ে রাস্তার এপাশে এসে দাঁড়াল, ঠিক তানার কাছটায়। দৃষ্টি কিছু দূরের একজোড়া রঙিন পাখির দিকে। ঝলমলে রোদে ছুটোছুটি করছে দুটিতে। তারও ওদিকে সারি সারি পাহাড়। সবুজ-ধূসর আভা।

আবার ছড়ি ছিলতে ছিলতে তানা বলল, 'শিকদারদের পুরোনো বাড়িটা যারা কিনেছে, তাদের ছেলে বুঝি তুমি?'

'হ্যাঁ।'

পিছু পিছু ধাওয়া করে ক্লান্ত পাখি দু'টো ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে উড়ছে ফসলের ডগা ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

'অ্যাই, হাঁ করে কী দেখছ? হাবা নাকি?' ধমকে উঠল তানা।

অনেক দুঃখের কালো ছায়া ভেসে উঠল ছেলেটার মায়াময় চোখে, ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। ঘুরে দাঁড়াল। চলে যেতে পা ফেলতেই মায়া লাগল তানার। 'দাঁড়াও। এটাও বোঝে না দেখি!' থমকে দাঁড়াল ছেলেটা। ঘাড় ফেরাল। অদ্ভুত হেসে রাস্তা থেকে ঢাল বেয়ে নেমে এল। পা ফেলার ধরনটাও যেন কেমন পিচ্ছিল। তানার পাশে এসে বিদঘুটেভাবে পা মুড়ে বসল। নাকের নীচে হালকা গোঁফের রেখা। সেদিকে চেয়ে হঠাৎ হেসে ফেলল তানা।

কালো হয়ে গেল শাওনের মুখ।

ছুরিটা দিয়ে ছড়ির ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে তানা একমনে। পাশে ছেলেটা। নীরব।

'বাস্টার তোমাকে দেখে অমন করে পালাল কেন?' খানিক

বাদে বলল তানা।

'জানোয়ারগুলো আমাকে পছন্দ করে না।'

'কেন?'

'জানি না।'

ওকে খুঁটিয়ে দেখল তানা। দেহের গড়ন দেখে মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছে। কিন্তু চোখ আর বিষাদ মাখা মুখটা নরম করে ফেলছে ওকে। ধানক্ষেত ছেড়ে পাখি দুটো এবার গাছের এ-মাথা ও-মাথায় নেচে বেড়াচ্ছে। কিচিরমিচির শব্দে কান ঝালাপালা করে দিল তানার।

'আগে কোথায় ছিলে তোমরা?'

'পার্বত্য চট্টগ্রাম। রামু।' খুব ধীরে জবাব দিল শাওন।

'চলে এলে কেন?'

'তা জানি না। বাবা বলেছেন, ওখানে আর থাকা যাবে না।'

গাছের ডালে ডালে লাফালাফি শেষ করে মাঠে নেমে পড়েছে পাখি দুটো। ঠুকরে ঠুকরে পোকা ধরে খাচ্ছে। একটা পাখি লাফাতে লাফাতে শাওনের একেবারে কাছটায় চলে এল। আচমকা কাঠ হয়ে গেল পাখিটা। স্থির। চুপ। তারপর খুব ধীরে ঘাড় কাৎ করে, পুঁতির মত চোখ মেলে দেখল শাওনের দিকে। বড় হয়ে উঠল চোখ। তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে ডানা ঝটপটিয়ে উঠল। প্রায় ছিটকে লনে গিয়ে পড়ল। তারপর গায়ে যত জোর আছে সবটুকু খাটিয়ে উড়াল দিল।

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে তানার।

পলায়মান পাখিদের দিকে নিষ্পলকে চেয়ে আছে শাওন। ওর দিকে ফিরে চাইল তানা। ভুরুদুটো অদ্ভুত। শুঁয়োপোকার মত মোটা, নাকের ওপর দিয়ে জোড়া। যেন একটাই ভুরু।

'তোমার ভুরুজোড়া কি বিচ্ছিরী,' বলল তানা। লজ্জায় কুঁকড়ে

গেল ছেলেটা। জবাব দিল না।

'কী হলো?' অনুতাপ হচ্ছে তানার। ভুরু নিয়ে খোঁটা দেয়া উচিত হয়নি।

'আমি আর সব মানুষের চেয়ে আলাদা,' শাওনের গলার স্বর বুজে এল।

উঠে দাঁড়াল তানা। মনটা খারাপ হয়ে গেছে ছেলেটাকে দুঃখ দিয়ে। বলল, 'চল, বেড়িয়ে আসি। অনেক বেড়াবার জায়গা আছে বান্দরবনে। কেল্লা দেখবে? ভারি সুন্দর।'

'কেল্লা? খুব মজা হবে তা হলে,' খুশিতে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ওই পাহাড়ের ওপর তৈরি কেল্লা। আর আছে গুহা, মাইলের পর মাইল লম্বা,' হাত লম্বা করে বোঝাতে চাইল তানা।

'আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে?' খুশিতে ঝলমল করে উঠল মুখটা।

'এই তো, গোমড়ামুখোর রা ফুটেছে,' ওকে হালকা করতে চাইছে তানা। 'দাঁড়াও, টর্চটা নিয়ে আসি।'

উঠে দাঁড়াল শাওন। গুটানো ইস্পাতের স্প্রিং যেন পাক খুলে সিধে হলো। তানার সাথে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। 'কটা বাজে এখন?' হেলে পড়া সূর্যের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'তিনটে প্রায়।'

'গুহা কি অনেক দূরে?'

'মাইল দু-তিন হবে।'

'কিন্তু সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে আমার।'

'সে হবে'খন,' পা বাড়াল তানা।

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল শাওন।

'সাতটায় কেন?' বিরক্ত হয়ে বলল তানা।

'বাবা আর মা ভীষণ রেগে যাবে।'

'ইস্, কচি ছেলে যেন!'

বোকার মত চেহারা হয়ে গেল শাওনের। পিছু পিছু তানাদের গাড়ি-বারান্দায় এল ও। ওকে দাঁড়াতে বলে তানা গেল বাড়ির ভেতরে। রান্নাঘরে মা ভীষণ ব্যস্ত। ওয়াশ বেসিনের তলা থেকে টর্চটা তুলে নিল ও। চুপি চুপি পালিয়ে আসছিল, থমকে দাঁড়াল।

'কোথায় যাচ্ছিস, পাজী মেয়ে?'

'গুহায়, ওই নতুন ছেলেটাকে নিয়ে,' ভয়ে ভয়ে বলল তানা।

'দাঁড়া, তোর দস্যিপনা বের করছি। দিন দিন ধিঙ্গি হচ্ছিস, খেয়াল নেই বুঝি? আজই তোর বাবাকে–'

কেঁদে ফেলল তানা। আজকাল মা কথায় কথায় ধিঙ্গি বলেন। ভীষণ পচা একটা গালি।

দমে গেলেন মিসেস হক। আদুরে মেয়ে। বললেন, 'ঠিক আছে যাও, পথ হারিয়ে বোস না আবার। তোমার সাথের ছেলেটা আবার কে?'

'শাওন। আমাদের পাড়ায় বাড়ি কিনেছে ওরা।'

'যাক, খেলার সাথী পেলি তা হলে। নিয়ে আয়– দেখি।'

'ওই তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, এসো না।'

বাইরে এসেই থমকে দাঁড়াল ওরা। সিঁড়িতে শাওন আর বাস্টার মুখোমুখি। বাস্টার একবার এগুচ্ছে, আবার নেউলের মত এঁকেবেঁকে পিছিয়ে যাচ্ছে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে শাওনের চেহারা। গুঁড়ি মেরে রয়েছে অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে। মনে হয় যেন যে কোন মুহূর্তে লাফ দেবে। চিৎকার করে ডাকল তানা, 'বাস্টার! বাস্টার! যা-ভাগ।'

রক্তলাল চোখে তানার দিকে চাইল বাস্টার। দু-চোখে যেন

দুটো লাল বাতি জ্বলছে। কষা বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁট দাঁতের ওপর থেকে সরে গেছে। লেজ গুটিয়ে দু-পায়ের তলা দিয়ে চেপে বসেছে পেটের তলায়। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ভয় পেয়েছে ঠিক কিন্তু লক্ষণ দেখেই তানা বুঝল এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পিঠ বাঁকিয়ে মাথা নিচু করে এক পা এগিয়ে এল বাস্টার। দাঁত খিঁচোনো বেড়ে গেল আরও।

'তানা– সরে আয়!' পেছন থেকে চিৎকার করে উঠলেন মা।

চকিতের জন্যে মায়ের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল তানা– যা কিছু ঘটবার ঘটে গেল ওইটুকু সময়ের মধ্যে।

বাস্টার তেড়ে গেল শাওনের দিকে। হ্যাঁচকা টান পড়ল তানার শরীরে। ওর স্কার্টের পকেটে রাখা রুপো বাঁধানো ছুরিটা টেনে নিয়েই বাস্টারের মাথা লক্ষ্য করে কোপ মারল শাওন। সব সাহস উবে গেল বাস্টারের। বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরেই ছুটে গেল লনের ওপর দিয়ে। পাড়া কাঁপিয়ে অদ্ভুত ভয়ার্ত গলায় ডাকছে বাস্টার।

'ছুরিতে রুপো– ছুরিতে রুপো!' ছুরি ফেলেই তীক্ষ্নস্বরে চেঁচিয়ে উঠল শাওন। মেঝেয় পড়ে থাকা ছুরিটার দিকে সম্মোহিতের মত চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে এক পলকে ছুটে গেল রাস্তায়। মিলিয়ে গেল হাওয়ার বেগে।

কোনও ছেলেকে এত জোরে দৌড়ুতে দেখেনি তানা।

বিকেল পাঁচটায় ফিরে এল বাস্টার। তানা দেখল ওর চোখে-মুখে ভয় আর অস্থিরতা। গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিঁড়ির ধাপে পা তুলে দিয়েও নামিয়ে নিচ্ছে বার বার। ঘুর ঘুর করছে লনের ওপর। যেখানে যেখানে শাওন হেঁটেছে, দৌড়েছে– সেই সেই

জায়গাগুলোর গন্ধ শুঁকছে আর চাপা গলায় রক্ত জমানো গর্জন করে উঠছে থেকে থেকেই।

পরদিন বিকেল তিনটে। বড় বড় ঘাস ছাওয়া মাঠ পেরিয়ে একেবারে চৌধুরী বাড়িতে পৌঁছুল তানা।

আপন মনে খেলছে শাওন। তানাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল কাঠের মত। টান-টান হয়ে দাঁড়িয়েছে। চম্পট দেবার মতলব।

'বাস্টার কাল তোমার সাথে ভারি খারাপ ব্যবহার করেছে।'

চুপ করে রইল শাওন। দু-হাত কোমরের পেছনে।

'হাতে কী?'

বিকৃত হয়ে গেল শাওনের মুখ।

'দেখি?' পেছনে গিয়ে দাঁড়াল তানা।

'ওমা! এ-কী!' চিৎকার করে পিছিয়ে গেল তানা।

একটা ইঁদুর! গুটিয়ে বলের মত হয়ে আছে। হাঁ হয়ে গেছে মুখটা। পালাবার চেষ্টাও করছে না। আতঙ্কে চকচক করছে ছোট ছোট কালো চোখ দুটো।

'গোলা ঘরে ধরলাম,' বলল শাওন।

'গা ঘিন ঘিন করে না তোমার?'

কদাকার হয়ে উঠল শাওনের চেহারা, এই বুঝি কেঁদে ফেলবে।

'আরে, আরে! গেল, যা!' ততক্ষণে ইঁদুরটা লাফিয়ে পড়েছে মাটির ওপর। বলের মত গুটিসুটি মেরে খানিকক্ষণ পড়ে থেকেই আচমকা উল্কা বেগে ছুটল গোলাঘরের দিকে। প্রথমে ধাক্কা খেল কাঠের পার্টিশনে, পিছিয়ে এল হঠাৎ, এদিক ওদিক পিছলে গিয়ে স্যাৎ করে ঢুকে গেল একটা ফোকরের ভেতর।

অবাক চোখে চেয়ে রইল সেদিকে তানা।

‘জানোয়ারদের আমি ভালবাসি কিন্তু ওরা ভয় পায় আমাকে,’ ক্ষীণস্বরে বলল শাওন। ‘গতকাল তোমার কুকুরটাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে।’

‘ও-সব মনে রেখো না,’ বাড়ির ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বলল তানা।

চৌধুরী সাহেব মাঝবয়েসী। হাঁটেন অদ্ভুত মসৃণ ভঙ্গিতে। শাওনের বাবা-মা লাঞ্চ খাচ্ছিলেন। ওদেরকে ঘরে ঢুকতে দেখেই দু’জনে উঠে দাঁড়ালেন টেবিল ছেড়ে, সেকেলে সৌজন্য দেখিয়ে। টেবিলে খাবার পড়েছিল তখনও। দেখেই চোয়াল ঝুলে পড়ল তানার।

কাঁচা মাংস। লাল টকটকে রক্তরস মাখানো গরুর মাংসের মস্ত একটা পিণ্ড টেবিলের ঠিক মাঝখানে।

তানার বিস্ময় লক্ষ করলেন চৌধুরী সাহেব। বললেন, ‘রক্ত ভাল থাকে বলে হপ্তায় দু’তিন দিন কাঁচা গরুর মাংস ছাড়া কিছুই খাই না আমরা।’

শির শির করে একটা ঠাণ্ডা স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল তানার। মাথা নিচু। চোখ তুলে চাইতে ভয় করছে। শাওনের মা কেমন বড় বড় চোখ করে দেখছে ওকে। দেখছে না, যেন গিলছে। অজানা একটা ভয় দুরু দুরু করে উঠল বুকের ভেতর।

চৌকাঠ পেরিয়ে কর্তা আর গিন্নী এগিয়ে দিলেন দুজনকে। রোদ্দুর পড়েছে শাওনের বাবা-মার চোখে-মুখে। অবিকল শাওনের ভুরুর মত মোটা আর জোড়া। শাওনের মা চিন্তাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে আছেন তানার দিকে। গরুর মত বড় বড় চোখে হঠাৎ দ্যুতি খেলে গেল যেন।

‘গুহা দেখে সাতটার মধ্যে ফিরে এসো, শাওন,’ বেশ

খানিকটা চলে আসতে চিৎকার করে বললেন শাওনের মা।

পাহাড়ের গায়ে পাথরের দেয়ালে এক টুকরো কালো দাগের মত দেখা যাচ্ছে। গুহায় ঢোকার প্রবেশ পথ। নুড়ি পাথরগুলো তখনও গরম। কালো গর্তের সামনে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে শীতল হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল মুখে। এর আগে কয়েকবার এসে পথ-ঘাট সব মুখস্থ হয়ে গেছে তানার। ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে তানা, পিছিয়ে গেল শাওন। 'তানু–'

'কী হলো?'

'সাতটার আগে আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে কিন্তু।'

'ওহ্, শুনে শুনে কান পচে গেল আমার! কী হবে সাতটায় না ফিরলে?'

'তা জানি না। পথ হারিয়ে ফেলবে না তো?'

'না।'

'চাঁদ ওঠার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে।'

'চাঁদের সঙ্গে তোমার বাড়ি ফেরার কী সম্পর্ক?'

জবাব দিল না শাওন। ভয়ে ভয়ে চেয়ে রইল কালো গর্তের দিকে।

'চলে এসো। বলছি তো, পথ হারাব না।' কালো ফোকর দিয়ে ভেতরে পা দিল তানা। দ্বিধাগ্রস্ত পা ফেলে পেছন পেছন এল শাওন।

যত এগুচ্ছে আঁধার বাড়ছে একটু একটু করে। ভীতুর ডিম! দেখি তোমার সাতটার সময় কী হয়– হারাবার ভান করব শুধু। মনে মনে ভাবছে তানা।

সুড়ঙ্গপথ ঢালু হয়ে নামতে নামতে ডানদিকে ঘুরে গেল– গুহা শুরু হয়েছে এখান থেকে। টর্চ জ্বালল তানা। সশব্দে নিঃশ্বাস

ছাড়ল শাওন। চারদিকে রঙ-বেরঙের পাথর। নীল, সবুজ, পান্না, গোলাপী, লাল, হলুদ, ল্যাভেন্ডার– বিচিত্র রঙের বাহারি ঝালর, কার্পেট, ফোয়ারায় চারদিক ঝিলমিল করছে– নেমে গেছে ষাট ফুট নীচের গুহা অবধি। তারপর অন্ধকার সুড়ঙ্গ।

টর্চ ঘুরিয়ে আলো ফেলে আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যগুলো শাওনকে দেখাল তানা। 'চলো, আরও নীচে যাই।'

রঙিন খড়ি রঙের পাথর ছাওয়া সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে নেমে এল দু'জনে। প্রতিধ্বনির খেলা চলছে যেন। এক কথা হাজার কথা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। বাতাস শীতল এবং শুকনো। টর্চ থেকে ছুটে আসা আলোর রেখা গুহার অন্ধকার যেন নিভিয়ে দিতে চাইছে। আঁধার কেটে কেটে ছুরির ফলার মত আলো আছড়ে পড়ছে পাতাল সৌন্দর্যের দিকে। টর্চের আলো নীচের দিকে ফেলল তানা। পাথর ঢেউ খেলে নেমে গেছে। সিঁড়ির মত ধাপ। নীচে নেমে এল ওরা।

'অপূর্ব!' ফিসফিস করল শাওন।

'সত্যি।' খিল খিল করে হেসে উঠল তানা।

'এখন কটা বাজে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল শাওন।

'চারটে হবে।' মিথ্যে বলল তানা।

মোহিত হয়ে পড়েছে শাওন। প্রকৃতির এমন রূপ ও আর দেখেনি। মাথার ওপর জমে যাওয়া জলধারার মত চুনা পাথরের সবুজ, নীল, উজ্জ্বল কমলা রঙের ঝুলন্ত স্ট্যালাকটাইট– কোথাও স্তম্ভের পর স্তম্ভ রচনা করেছে শঙ্কু বা পেন্সিলের আকারে। পায়ের তলার আর দু'পাশের দেয়াল ঢেউ খেলানো– যেন হঠাৎ কোন্ যাদু স্পর্শে নীল, গোলাপী, লাল রঙের লাভা জমে গেছে মাঝপথে। নীল-কালো রঙের সরোবর, স্থির নিস্তরঙ্গ। কাঁচ

পাথরের ঢাল বেয়ে পোকার মত উঠে এল ওপরে ওরা দুজন। সবক'টা সুড়ঙ্গ-ই তানার পরিচিত। ধবধবে সাদা রঙের রাজকীয় প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়ল ওরা। হঠাৎ টর্চ নিভিয়ে ফেলল তানা। ভয়াবহ নৈঃশব্দের ভেতর থেকে আর্তস্বর ভেসে এল, 'তানু!'

চট করে টর্চ জ্বালল আবার। তানার একেবারে কাছটায় এসে দাঁড়িয়েছে শাওন। ওর হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে তানা।

'ভয় পেয়েছ?' খিল খিল করে হেসে উঠল তানা। 'এবার ফেরা যাক– হাতটা চেপে ধর!' পথ দেখিয়ে ওকে নিয়ে এল গুহা-মুখের কাছে।

'তুমি অমন ভয় পেয়েছ কেন?' জিজ্ঞেস করল তানা। উত্তর নেই। শুধু ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সামনের দিকে।

'সাতটার' রহস্য জানতেই হবে আজকে আমার। মস্ত একটা ভজকট আছে। কী সেটা? ভাবছে তানা।

'শাওন, কোন্ দিক দিয়ে ঢুকেছিলাম ঠাহর করতে পরছি না যে,' পথ হারাবার ভান করছে ও। শাওনের মুখের দিকে চাইল।

দু-চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে ছেলেটার, 'তানা... তানা... তুমি কিন্তু কথা দিয়েছ!'

'কথা তো দিয়েছি, কিন্তু তোমাকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যে এসে পড়লাম বুঝতে পারছি না।'

'তানা,' আর্তনাদ করে উঠল শাওন। 'বেরোতে আমার হবেই–'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও... এই দিক দিয়ে মনে হচ্ছে বের হওয়া যাবে।'

প্রবেশ পথকে চক্রাকারে ঘিরে আছে একটা পথ– বিরাট বিরাট থাম, সুড়ঙ্গ আর জুলন্ত পাথরের ঝালর। এক চক্কর ঘুরে এল তানা ওই পথ দিয়ে। আধঘণ্টা পর গুহা-মুখের একশো ফুট

নীচে থেমে দাঁড়াল। 'এ-কী! সব যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে,' কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলল তানা।

'কটা বাজে মনে হয়?' বিষম ঘাবড়ে গেছে শাওন।

'সাড়ে ছ-টা তো বটেই।'

শিউরে উঠল শাওন। চোখ দুটো জ্বলে উঠল ক্ষুদে ভাঁটার মত।

'কিন্তু বেরোই কী করে?'

'চেষ্টা করো, তানু, চেষ্টা করো। কিছুই কি মনে পড়ছে না?' মিনতি ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠে।

মনস্থির করে ফেলেছে তানা। দেখবে ও আজ সাতটার পর কী হয়।

আবার আর একটা চরকি-পথ ঘুরিয়ে গুহা-মুখের সামনে এনে ফেলল শাওনকে। পাহাড়ে ঢুকবার ফাটলটা ঠিক মাথার ওপরেই।

'তানা,' কণ্ঠস্বর পাল্টে গেছে শাওনের। কাঁপছে থর থর করে।

'কী হলো?'

অপলকে চেয়ে আছে শাওন গুহার ছাদের দিকে।

টর্চের আলোয় দেখল তানা, শাওনের ঘাড় যেন গোল হয়ে যাচ্ছে, দৃষ্টি অমানুষিক হয়ে উঠছে—মনে হয় ছাদ ফুঁড়ে কোনও বিভীষিকা নেমে আসছে, সেটা দেখতে পাচ্ছে ও।

'শাওন!' অস্ফুটে ডাকল তানা।

'মা— ও মাগো,' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল শাওন। আচমকা পিঠটা আড়ষ্ট হয়ে গেল। দু-হাত সামনে বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরল বাতাস। অশ্রুসিক্ত চোখ কপালে উঠে ফের নেমে এল তানার দিকে। গুঙিয়ে উঠল জান্তব স্বরে, 'তানু... চাঁদ উঠেছে... টের পাচ্ছি।' বলতে বলতে দুমড়ে মুচড়ে শাওনের মুখখানা বীভৎস

ভয়ংকর হয়ে উঠল। কনকনে বরফের স্রোত নেমে এল তানার শিরদাঁড়া বেয়ে! ভয় পেয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল ও। তারস্বরে ডাকল, 'শা-ও-ন, চোখ তুলে দ্যাখো... ওই ওখান দিয়ে ঢুকেছিলাম ভেতরে। চলে এসো-।'

জবাব দিল না শাওন।

গুহার মেঝেয় পুঁটলির মত তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে। টর্চের আলো ফেলতেই নড়ে উঠল। আঙুলের নখ পাথরের ওপর ঘষটে গেল। এত জোরে শব্দ, মনে হয় পাথর খুবলে তুলে আনবে। তানা কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। টর্চের এলোমেলো আলো হঠাৎ শাওনের ওপর স্থির হতেই হৃৎপিণ্ড বাড়ি খেল তানার বুকের পাটাতনে। অঙ্গারের মত জ্বলছে দু-চোখ। হলুদ আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে মণি দিয়ে।

চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেল তানা। শাওনের চোখ যেন আরও কাছাকাছি চলে আসছে, আরও হলুদ হয়ে উঠছে।

টর্চ খসে পড়ল পায়ের কাছে। ঝন ঝন শব্দে ভাঙল কাঁচ। নিভে গেল আলো। নিঃসীম আঁধারে মচমচ মড়মড় আওয়াজ শোনা গেল, সাথে চাপা একটা পাশবিক গর্জন।

বিকট চিৎকার দিয়ে ছিটকে পড়ল তানা। পায়ে লাগল টর্চটা। ঝট করে এক হাতে টর্চ তুলে নিয়ে আরেক হাতে কোমরের বেল্ট থেকে টেনে বের করল রুপো বাঁধানো ছুরিটা। দেহের সমস্ত জোর দিয়ে কোপ মারল পাশে। টর্চের বোতাম টিপে ধরল। ছড়িয়ে পড়ল আলো।

নেই শাওন!

বিস্ফারিত চোখ মেলে ধরল ও। হাঁটু গেড়ে বসে টর্চের আলো ফেলল ডানে বামে, সামনে-পেছনে।

কাঁপা স্বরে ডাকল, 'শা-ও-ন!'

সাড়া নেই।

টলমল করে উঠে দাঁড়াল তানা। পা কাঁপছে।

পেছনের অন্ধকারে পাথরের ওপর নখ আঁচড়ানোর আওয়াজ। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল তানা। দুরন্ত সাহসী মেয়ে সে। জীবনে এমন ভয় পায়নি। টর্চের মৃদু আলো একটা নিচু মত ছায়ার ওপর পড়ল। স্যাঁৎ করে সরে গেল ছায়াটা গুহার এক কোণে। অন্ধকারে ভাঁটার মত জ্বলছে হলুদ চোখ।

'শা-ও-ন।' ফাটা বাঁশের মত শব্দ বেরুল তানার কণ্ঠ ছিঁড়ে।

সাদা ছুঁচোল দাঁতের সারি। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ চেয়ে আছে তানার দিকে।

কিছু বোঝার আগেই লাফ দিল তানাকে লক্ষ্য করে।

মামনুন শফিক

প্রতিশোধ

আরে! এটা আবার কে? ঝট্ করে পেছন ফিরল জাভেদ। কেউ নেই! সাদা দেয়ালে এঞ্জেলোর পেইন্টিংটার ওপর একটা ঢাউস টিকটিকি মুখ তুলে চাইল শুধু। তা হলে! আবার তাকাল জাভেদ হাতে ধরা মাঝারি সাইজের আয়নাটাতে। সাথে সাথে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে সরীসৃপ চলার অনুভূতি হলো। আয়নায় সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা মুখ। অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে, বিচ্ছিরী কালো কালো দাগে ভরা, গা ঘিন ঘিন করা বিশ্রী রকমের মুখ। মুখ! মুখ নাকি এটা! হঠাৎ তাকালে মনে হবে কঙ্কালের মুখের ওপর একটা চামড়া টানটান করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নাক আর চোয়ালের হাড় বিদঘুটে রকমের উঁচু। সামনের মাড়িটাও! তাতে করে ভয়ংকর রকমের বিদ্রূপাত্মক ঠেকছে ওর হাসিটা। ঠাণ্ডা মড়া মানুষের চোখ– চাইলেও অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে।

দূর! দূর! মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি আমার! আয়নাটা টেবিলে রেখে বাইরে তাকাল জাভেদ। ঝকঝকে রোদ। পাতার গুঞ্জন। প্রাণকাড়া একটা গন্ধ। বসন্তকাল। পি-উউক শব্দে একটা পাখি উড়ে গেল সামনের গাছটা থেকে। জাভেদের হাসি লাগল, জানালা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ও। এটা মাইক্রোসার্জারীর যুগ, ঢাকা শহর, ভর দুপুর। নিজের মুখটাতে

একবার হাত বুলাল ও। মাড়িটা কি উঁচু ঠেকছে?... আরে ধ্যাৎ! তা হলে এ কাকে দেখছে আয়নায়। আর্ভিং-এর রিপভ্যান উইঙ্কল জাতীয় কিছু, নাকি ইলিউশন? জোরে একবার হাতে চিমটি কাটল জাভেদ, আয়নাটার দিকে হাত বাড়াল আবার। সাথে সাথে শিউরে উঠল শরীর। যদি আবার দেখে! অনেকদিন ধরে সুরাটুরা মনে নেই। বিসমিল্লাহ্ বলে এক ঝটকায় টেনে নিল ও আয়নাটা। কে, কে ওটা?

কেউ নেই! নিস্তব্ধ দুপুরের অখণ্ড নীরবতা ভেঙে ডেকে উঠল শুধু টিকটিকিটা। চমকে উঠল জাভেদ। আবার তাকাল আয়নার দিকে। সেই মুখ! সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের ওপরকার চুলগুলো। বুকের ভেতর ধুকপুক শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছে! উন্মাদের মত আয়নাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল জাভেদ। বেশ কিছুক্ষণ পর উঠে একগ্লাস পানি খেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে বসল ও। এরকম হবে কেন? বিজ্ঞানের ছাত্র ও– কোনও ব্যাখ্যাই খুঁজে পেল না। এটা নিয়ে তো পাঁচবার হলো। মানসিক বৈকল্য? অসম্ভব! আর এরকম তো কোনওদিনই হয়নি। তবুও অনেকবার নিজেকে অটো-সাজেসন দিল জাভেদ– তুমি আয়নায় নিজেকেই দেখবে, তুমি আয়নায় নিজেকেই দেখবে...

আরেকবার বাইরে তাকাল জাভেদ। কী সুন্দর, নির্মল পৃথিবী। মনের জোরকে ঘুষ দেবার জন্য একটা গানও গাইবার চেষ্টা করল ও, হলো না। হঠাৎ ক্ষেপে গেল জাভেদ। তেইশ বছরের একজন সুস্থ সবল যুবকের অশরীরী ভয়! ঝটপট ভাঙা কাঁচগুলো এক করে আবার তাকাল সেদিকে। সাথে সাথে সাহসের বেলুনটা ফুটুস হয়ে গেল। ডুকরে প্রায় কেঁদেই ফেলল জাভেদ। অজান্তেই হাতটা উঠে এল মুখের ওপর... অ্যাঁ,

চোয়ালের হাড়টা একটু উঁচু উঁচু ঠেকছে না, মাড়িটাও তো! মুখ দিয়ে গোঙানির মত আওয়াজ তুলে আবার উপুড় হলো বিছানায়। এসব কী হচ্ছে!

'ভাইয়া, এই ভাইয়া, দরজা বন্ধ করে রেখেছিস কেন?'

মানুষ! তড়াক করে লাফিয়ে উঠে লিলির ডাকে সাড়া দিতে ইচ্ছে করল জাভেদের। কিন্তু দরজার সামনে এসেই থমকে দাঁড়াল ও। সত্যিই যদি চেহারা বদলে গিয়ে থাকে! লিলি দেখার পর কী করবে? মাগো... চিৎকার...।

নাহ্, না... পেছনে হটতে হটতে আবার বিছানায় বসে পড়ল জাভেদ। খামচে ধরল নিজের চুল... কী করবে এখন?

'এই ভাইয়া, ভাইয়া! দরজা খুলছিস না কেন? ভেতরে একটা বই আছে আমার! এই ভাইয়া!'

জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগল লিলি। ভয়ে চুপসে গেল জাভেদ। কী করা উচিত এখন? হঠাৎ বুদ্ধিটা এল মাথায়। জোরে চিৎকার করে বলল, 'এই লিলি, তুই কী শুরু করলি। আমি ঘুমুচ্ছি, জলদি ভাগ এখন!'

'ঘুমাচ্ছিস! তুই আবার দুপুরে ঘুমাস নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে আমার বইটা অন্তত দে– এস্ট্রোলজী– হেলেন হিচককের।'

'তুই গেলি না! বললাম না উঠতে পারব না এখন।'

'ঢং!' জোরে আরেকবার কড়া নেড়ে চলে গেল লিলি।

জাভেদ যেন দেখতে পাচ্ছে ওর চলে যাওয়া। ধুপধাপ পায়ে, বেণী দুলিয়ে। অভিমানে হয়তো সারাদিন কথাই বলবে না আজ ওর সাথে। কিন্তু জাভেদ কী করবে! আচ্ছা, ওর মাথার কাছের দেয়ালেই তো একটা বড় গোল আয়না টাঙানো আছে। তাইতো! ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল জাভেদ। সেই মুখ। সব ঠিক আছে, শুধু চেহারাটাই অন্যজনের।

মুখ ভেঙচাল জাভেদ, আয়নার ভেতর প্রতিচ্ছবিটাও। চোখ টিপল, ওটাও; শেষে নিজের মাথার চুল নিজেই জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল ও। কী করবে এখন? কী করবে? কাল বিকেলের পর আর আয়নায় মুখ দেখেনি জাভেদ। আজ দুপুরে খাওয়ার পর দুটো বই পড়ছিল। প্রাচীন ইহুদিদের কাহিনিটা ভাল লাগছিল না বলে পিরামিড যুগের ব্ল্যাক আর্টের ওপর আরেকটা বই। বইটা অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর, গা ছমছম করা। তারপর শেভ করার দরকার আছে কিনা বুঝতে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে আয়না টেনে নেয়া। এবং তারপরই...।

আসলেই কি চেহারা বদলে গেছে! কেন, কবে, কীভাবে? বদলে গেলেও অন্তত দুপুরে খাওয়ার সময় পর্যন্ত না। আর বদলাবেই বা কেন? পৃথিবীর ইতিহাসে তো এমন রোগ নেই। একবার কাউকে ডেকে বলবে ব্যাপারটা? কিন্তু তা হলে তো সবাই জেনে যাবে ব্যাপারটা। মানে, যদি সত্যিই বদলে গিয়ে থাকে। তারচেয়ে বরং...। কিন্তু কতক্ষণ আর এই ঘরে বসে থাকা যাবে। মাথাটা ধরে এল জাভেদের। উঠে একটু পানি খেয়ে নিল আবার। কী করবে ও, কী করবে? চোখ পড়ল সিডাক্সিন চারটের ওপর।

ঘুম না ঠিক, তন্দ্রার মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখছিল। চোখ মেলল কড়া নাড়ার শব্দে। খটাখট খটাখট, ভীষণ জোরে। সাথে সাথে চিৎকার। বাবার, লিলির এবং মায়ের। কটা বাজে এখন, সব্বোনাশ, রাত এগারোটা! এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল! আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়ল জাভেদের। চরম অস্বস্তিকর একটা অভিমান আর কান্নায় ভেতরটা যেন ফেটে যেতে চাইল ওর। খটাখট খটাখট, দরজায় আরও জোরে আওয়াজ। সেই সাথে

বাবার গলাও শোনা গেল, 'লক্ষণ ভাল ঠেকছে না, লিলির মা। পুলিশে খবর দেব নাকি!'

'অ্যাঁ!' হাউমাউ করে কেঁদে উঠল মা। 'আমার ছেলের কী হলো গো।'

'আরে কিছু না বোধহয়! ব্যস্ত হয়ো না, আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি।'

'না!' চিৎকার করে উঠল জাভেদ। 'না, বাবা, না। আমি ভালই আছি।'

'জাভেদ! বাবা, কী হয়েছে তোর?' মার ডুকরানো গলা শুনতে পেল জাভেদ।

'জাভেদ, দরজা খোল। এসব কী শুরু করেছিস তুই।'

এক মুহূর্ত ভাবল জাভেদ। নাহ্' ভেবে কিছুই হবে না। ডান হাতের মুঠো দিয়ে বাঁ হাতের তালুতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মেরে উঠে দাঁড়াল ও। দরজা খুলেই আবেগে একেবারে ভেঙে পড়ল। ছোট্টবেলাকার মত মুখ লুকাল মার বুকে। 'মা...মাগো!'

'বাবা! তুই অমন করছিস কেন, বাবা! দেখি তোর মুখটা। দেখি, কোনও অসুখ...

'না!' বিকৃত স্বরে চিৎকার করে উঠল জাভেদ। 'না মা! না, প্লিজ!'

'এই জাভেদ, ননসেন্স!' ভারি গলায় ধমকে উঠে মুখটা টেনে তুলল বাবা। 'কীরে, চোখ বন্ধ করে আছিস কেন। দেখি দেখি, তোর গাটা। এই স্টুপিড, তুই এমন করছিস কেন? তোর তো কিছুই হয়নি।'

উত্তেজনায় শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল জাভেদের। কিছু হয়নি... অসম্ভব। কিন্তু কই, মা-বাবা এমনকী ভীতুর ডিম

লিলিটাও তো একটা চিৎকার দিয়ে উঠল না ওর মুখটা দেখে। আস্তে আস্তে চোখ মেলল জাভেদ। ভারি লেন্সের চশমা পরা বাবার চোখে স্পষ্ট বিরক্তি, মার চোখে স্নেহের ঝর্ণা, লিলির চোখে রাজ্যের কৌতূহল। 'এই ভাইয়া, হাঁদারাম! কী স্বপ্ন দেখেছিস?'

স্বপ্ন! এটা কি স্বপ্ন! কই, একটা পরিচিত মানুষও তো চেঁচিয়ে উঠল না ওকে দেখে, সবাই স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করছে, একদম আগের মতই। অথচ আয়নার সামনে গেলেই সেই মুখ। সবরকমের, সব জায়গার আয়নায়, স্টিলের আলমারির, ড্রেসিং টেবিলের দেয়ালের, গাড়ির, সেলুনের সব আয়নাতেই ভেসে ওঠে সেই বীভৎস মুখ। প্রথম প্রথম প্রচণ্ড ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল জাভেদ। কতদিন লিলির সঙ্গে, মার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। টেনে এনেছে আয়নার সামনেঃ দেখো, দেখো আয়নায় ওটা কার মুখ!

'কেন? তোর!'

'আমার! আমার কী মাড়ি উঁচু? মুখটা কঙ্কালের মত! কালো কালো দাগে ভরা?'

তুই এসব কি বলছিস রে, এরকম হবে কেন? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

মাথা খারাপ...! জাভেদেরও সন্দেহ হয়েছিল। নাকি চোখ খারাপ...! কিন্তু কই, অন্য আর কোনও ব্যাপারেই তো মাথা খারাপের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে জাভেদের। সাত বছরের ভাগ্নে তানভীরকে রাজ্যের চুইংগাম ঘুষ দিয়ে ডেকে এনেছিল আয়নার সামনে। ফুটফুটে স্বর্গীয় একটা মুখের পাশে কুৎসিত বীভৎস একটা মুখ। কিন্তু

কই, তানভীর তো একটুও চমকাল না।

'এই মামা, বলো তো আয়নার ভেতর ওটা কে তোমার পাশে।'

'তুমি! জাভেদ মামা।'

'কেমন দেখতে বলো তো?' আয়নায় তাকিয়ে আবারও শিউরে উঠেছিল জাভেদ।

'সুন্দর! অনেক সুন্দর। আমি এখন যাই।'

তানভীর চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ থমকে বসেছিল জাভেদ। আসলেও কি আমি ভুল দেখছি? কিন্তু কেন? কীভাবে? আর কতদিন?

কী দরকার আর ভেবে। কেউ তো আর বুঝতে পারছে না। কোনও অতিপ্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে, বা হয়তো কোনও পাপে এই অবস্থা আমার! শুধু নিজেই দেখে যাব অভিশপ্ত মুখটা! এক কাজ করলে হয়, বরং কিছুদিনের জন্য ঘুরে আসি বাইরে কোথাও থেকে। পুরো এক সপ্তাহ আয়নায় মুখ দেখব না- দেখি ব্যাটা ভাগে কি না।

'জাভেদ, হেই জাভেদ।' কলিংবেল, কড়া নাড়া, চিৎকার তিনটেই একসাথে। সেলিম ব্যাটার স্বভাবটাই এরকম। বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে, অগত্যা জাভেদকেই খুলতে হলো দরজাটা।

'তুই! এতদিন পর?'

'কী রে শালা, কী খবর তোর?' জাভেদের বিস্ময় তলিয়ে গেল সেলিমের উচ্ছ্বাসে। 'কী নাকি আজেবাজে বকিস আজকাল?'

'আরে কীসের!' বন্ধ করে দিল জাভেদ দরজাটা, 'আয়, আমার ঘরে বসি!'

'তুমি শালা...'

'চুপ, চুপ!' জাভেদ তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিল সেলিমের মুখে। 'বাবা আছেন ঘরে।'

'আরে ছোঃ! এখনও তুই "বাবাজাতীয় প্রাণী"র আতংক কাটিয়ে উঠতে পারলি না। তোকে দিয়ে...' আরও কিছু হয়তো বলত সেলিম কিন্তু জাভেদের ঠাণ্ডা চেহারা দেখে চুপ মেরে গেল সে।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল জাভেদ। 'নে যত খুশি চেঁচা এখন।'

'নারে, দোস্‌,' বিছানায় বসে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সেলিম। তারপর বুকে একটা টোকা মেরে বলল, 'ভেতরে সব জমাট বাঁধা দুঃখ রে!'

'মানে!' বেশ কৌতুক অনুভব করে জাভেদ। 'তোর আবার দুঃখ কীসের?'

'আমার দুঃখ? বেশ দার্শনিকের মত বলল সেলিম, 'দুঃখ নেই বলে।'

দু'জনেই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেও পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল সেলিম। 'আসলে কি জানিস দুঃখ না থেকেও যারা দুঃখী তাদের দুঃখের কোনও তুলনা নেইরে। তাদের তো কেউ বুঝতেই পারে না।'

'তাই নাকি! হ্যারে শেরীর সাথে...'

'আরে ধুর!' হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল সেলিম। 'তোরা তো গরীবদের দুঃখ বলতেই বুঝিস খাদ্য আর আমাদের দুঃখ বলতেই নারী...'

'আচ্ছা, এসব কথা বাদ দে। আসল কথা শোন,' বিছানা থেকে উঠে সোফাতে জাভেদের পাশে বসল সেলিম। 'আজ রাতে আমার বাসায় থাকবি, ভিসিআর দেখব। রমরমা

ফিল্ম হ্যায়!'

'রমরমা ফিল্ম... নারে এসব আর ভাল্লাগে না।'

'মানে।' সেলিমের ভ্রূ জোড়া দ্রুত কাছাকাছি চলে আসে। 'তোর গোনাডস গ্ল্যান্ডের অসুখ নাকি?'

'আরে নারে দোস, মনটা ভাল নেই!'

'উফ! ননসেন্স! সেজন্যেই তো সাধছি তোকে– মন ভাল হয়ে যাবে।'

একটু ভাবল জাভেদ, 'ঠিক আছে, যাব।'

বেশিক্ষণ থাকল না জাভেদ সেলিমের বাসায়। একঘেয়ে, আজকাল প্রচণ্ড একঘেয়ে লাগে ওর এসব ছবি। শেষ ছবিটার শুরুটা দেখে আর থাকতে পারেনি জাভেদ, ভীম কালো এক লোক বাচ্চা একটা মেয়ের পেছনে দৌড়াচ্ছে...।

ওয়াক থু, এসব কী ধরনের রুচিবিকৃতি! ক্লেদাক্ত অনুভূতিটা যেন জোঁকের মত আঁকড়ে ধরে আছে ওর মনটাকে।

সেলিমের বাড়ির একটু ডানেই অনেকটা জায়গা জংলার মত। তার মাঝখান দিয়ে একটা পায়ে চলা পথের শুরু। পথটা এসে থমকে গেছে বিলটার ঢালু প্রান্তের শুরুতে। বাড়ির দিকে যেতে যেতেই মন বদলে এই জংলার ভেতর দিয়ে হাঁটা শুরু করল জাভেদ। বিলটার ধারে একটু বসবে।

বিলের ধারটা নিঃঝুম! গাছপালার ফাঁক দিয়ে অনেক দূরের বাড়িগুলোর আলো অনেক ঝাপসা! আর কোথাও কোনও আলো নেই। নেই নাকি! আকাশের দিকে চাইল জাভেদ। অমাবস্যা! কয়লা রঙের আকাশের পটভূমিতে ইতস্তত তারারা যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। হঠাৎ জাভেদের মাথার ওপর দিয়ে ঝপটপ আওয়াজ তুলে উড়ে গেল কী জানি। সাথে সাথে পেছনে জংগল থেকে ভেসে এল বিশ্রী ঘনঘনে একটা কান্নার

আওয়াজ– শকুন-টকুন নাকি! হঠাৎ করেই ভয়টা পেল জাভেদ, কেউ যেন বুকের ভেতর ঠাণ্ডা আইস-ব্যাগ চেপে ধরেছে। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস আসছে বিলটা থেকে। বাতাসের সাথে স্রোতের মেলামেশা কেমন যেন ফিসফিসানো! কেউ যেন যেখান থেকেই হোক লক্ষ করছে ওকে। কথাটা মনে হতেই শিউরে উঠল জাভেদ। এমন লাগছে কেন! উঠে দাঁড়াল ও। সাথে সাথে ভীষণভাবে চমকে উঠল। সারা জঙ্গলটা মিশমিশে কালো অন্ধকারে ডুবে গেছে...লাইন চলে গেছে ওপাশের বাড়িগুলোর। হঠাৎ জোর দমকা বাতাসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল জাভেদ। হাঁটা শুরু করল ও– প্রথমে জোরেশোরে, পরে দৌড়ুতে শুরু করল।

চোখে অন্ধকার অনেকটা সয়ে আসছে। এই তো জঙ্গলে ঢোকার পথটা... ওই যে দূরে খুব আবছা সাদা একটা বাড়ির অস্তিত্ব। হঠাৎ করে ক্যকাক ক্যক করে প্রায় ঘাড় ছুঁয়ে উড়ে গেল একটা বড় পাখি। ওর ডানার ঠাণ্ডা বাতাসে শিউরে উঠল জাভেদ। তখনই আচমকা কীসের সাথে পা হড়কে পড়ে গেল ও। তাড়াতাড়ি উঠেই লক্ষ করল লোকটাকে। ওর কাছ থেকে মাত্র হাত কয়েক দূরে। খুব সাদা একটা কাপড় পরা, ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটছে। আস্তে, খুব আস্তে। লোকটা কোত্থেকে এল! 'এই যে ভাই, এই যে...'

আস্তে আস্তে ঘুরে তাকাল লোকটা। মেরুদণ্ডের ভেতর শীতল একটা সরীসৃপ যেন হাঁটতে লাগল জাভেদের... ঘাড়ের ওপরকার চুলগুলো উঠে গেল সড়সড় করে। চোখদুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। সেই লোকটা কঙ্কালের মত মুখ, সামনের দিকে বেরিয়ে পড়েছে ওপরের মাড়িটা, ভীষণ ঠাণ্ডা মরা মানুষের চোখ। ঢোক গিলতে গিয়েও আটকে গেল সেটা।

ভীষণ বিকৃত স্বরে কোনওরকমে জিজ্ঞেস করল জাভেদ, 'আ... আ... পনি...?'

এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। ঠাণ্ডা চোখে তীব্র ভর্ৎসনা। ঠোঁটের ওপর জোরে চেপে রেখেছে ঠোঁট। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল জাভেদের... কখন যে ধপ করে বসে পড়ল, নিজেই জানে না। কানের পাশটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল ওর। চোখের পাতা মেলতেও ভুলে গেল। অনেকক্ষণ পরে যেন অনেক দূর থেকে লোকটা বলল, 'আমি তোমার নিয়তি। মনে আছে তিন বছর আগে ঠিক এই দিনে একটা ছেলেকে মেরে ফেলেছিলে বহরমপুরে? ও ছাড়া দুনিয়ায় কেউ ছিল না আমার,' লোকটার কণ্ঠস্বর কেমন করুণ হয়ে গেল। 'খিদের জ্বালায় শহরে গিয়েছিল কাজ খুঁজতে, পকেট মারতে নয়। তুমি তাকে মেরে ফেললে। আমি ওর বুড়ো বাপ, অথর্ব। ও বেঁচে থাকলে আমার না খেয়ে মরতে হত না। মরার সময় ঠিক এরকমই হয়েছিল আমার চেহারা।'

মরার সময়! তারমানে লোকটা মরে গেছে। শরীরটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠল জাভেদের। কিন্তু ও তো ছেলেটাকে মারেনি! পকেটমার সন্দেহ করে চেঁচিয়ে উঠেছিল শুধু। তারপর সবাই মিলে...। একতাল মাংস হয়ে গিয়েছিল, চেনাই যায়নি ছেলেটাকে। কিন্তু ওরও কি আজ সেই অবস্থাই...। সম্মোহিতের মত তাকাল জাভেদ লোকটার দিকে। পচা ভ্যাপসা একটা গন্ধ ভেসে আসছে কোত্থেকে যেন! লোকটা এখনও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। আরে, লোকটা কই... এ যে একটা লাশ! গায়ে জড়ানো কাফনের সাদা কাপড়। ফুঁপিয়ে উঠল জাভেদ। লাশটা থেকেই ভেসে আসছে পচা ভ্যাপসা গন্ধটা! নিজের হৃদপিণ্ডের ধক ধক আওয়াজ শুনতে শুনতে জ্ঞান

হারাল ও।

কিচিরমিচির করে একটা পাখি অনেকক্ষণ ধরেই কাছের জামরুল গাছটাতে বসে দেখছিল জাভেদকে। জ্ঞান ফিরে প্রথম সেটাকেই দেখল জাভেদ। পুবদিগন্ত আবছাভাবে ফর্সা হয়ে উঠছে তখন! এখানে কেন ও। কিছুক্ষণ একেবারে হতচেতন হয়ে থাকল জাভেদ। আস্তে আস্তে সব ঘটনা মনে পড়ল ওর। সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কই, চারপাশে কোথাও তো তেমন কিছুই নেই। তবে কি স্বপ্ন দেখছিল ও! কিন্তু এত স্পষ্ট, জীবন্ত স্বপ্ন? আর এই জংগলে শুয়ে! অসম্ভব। ভয়ে আবার কুঁকড়ে যেতে চাইল জাভেদ। জংলাটা থেকে বেরিয়ে আসার পর অবশ্য ভয় অনেকটা কেটে গেল। এই তো সেলিমদের বাড়ি! এই তো এই রাস্তা দিয়ে আরেকটু গিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিলেই শেষ প্রান্তে ওদের বাড়িটা। মা, বাবা, লিলি... উত্তেজনায় দৌড়াতে লাগল জাভেদ। সমস্ত পাড়া নিশ্চুপ, তাই বোধহয় নিজের বাড়ির কড়া নাড়ার শব্দ খুব কর্কশ ঠেকল জাভেদের কানে। খুলছে না কেন? কড়া নাড়া আর কলিংবেল এক সাথে শুরু করল জাভেদ। আসছে বোধহয় কেউ, আবছা একটা পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। বাবা যদি হয়! জিজ্ঞেস করবেন, এত রাতে কোত্থেকে এলে? তোমার না সেলিমের বাসায় থাকার কথা! ওর তো কোনও কথাই বিশ্বাস করবে না কেউ। তা হলে।

খুলে গেল দরজাটা। পাল্লাটা সম্পূর্ণ ফাঁক হবার আগেই একটুখানি আঁচল দেখেই বুঝল জাভেদ... এটা লিলির শাড়ি। যাক, বাঁচা গেল। খুশিতে প্রায় চিৎকারই করে ফেলল জাভেদ, 'লিলি... ই... ই...।' সাথে সাথে ভীষণভাবে চমকে উঠল জাভেদ। এটা কার গলা। ততক্ষণে খুলে গেল দরজা। জাভেদ

দেখল লিলির মুখটা... বিস্ফোরিত চোখে প্রচণ্ড অবিশ্বাস আর আতংক। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপছে। তারপর আকাশ ফাটানো এক চিৎকার '...মা... গো...' এবং ভারি কিছু পতনের শব্দ।

নজরুল ইসলাম

লুকান্ডু

গল্পটা আলী চাচার মুখেই শোনা।– আমি তখন ব্রাহ্মণগাঁও হাইস্কুলে ক্লাস টেনে পড়ি। হঠাৎ করে আলী চাচা বিদেশ থেকে ফিরলেন। হাসিখুশি চাচাকে সেবার দেখলাম খুব গম্ভীর। কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না। সাতদিন যেতেই অস্থির হয়ে উঠলেন বাড়ির মুরুব্বীরা। ঠেসে ধরলেন আলী চাচাকে কী বিষয় তা জানাবার জন্যে।

বাধ্য হয়ে মুখ খুললেন চাচা। দাদা তাকে নিয়ে গেলেন দোতলায়। বড়রা সবাই গেল সঙ্গে। আমাকেও কেন জানি না বড়দের দলে ফেললেন দাদা। গোল হয়ে খাটে বসে আলী চাচার কাহিনি শুনলাম আমরা:

চার বছর আগে বাড়ি থেকে জাপান রওনা হই আমি। তোমরা জানতে না আমি কোথায় যাচ্ছি। এখন তো জাপানে এই বিক্রমপুর এলাকারই কয়েক শত লোক আছে। তখন বিশেষ কেউ ছিল না।

সেজন্যেই খুব একটা সুবিধে করতে পারলাম না। ইয়োকোহামা বন্দরে পুলিস আমার পিছু নেয়। কোথাও টিকতে পারলাম না। শেষমেশ একটা আফ্রিকান জাহাজে গিয়ে উঠলাম। লাইবেরিয়ান পতাকাযুক্ত সেনেগালী জাহাজ। লুকিয়ে

উঠেছিলাম এই ভেবে যে দু'তিন দিন লুকিয়ে থাকলে ফিরে যাবে পুলিস।

ঘটনা হলো উল্টো। আমি জাহাজে ওঠার পরের দিনই ছেড়ে দেয় জাহাজ। প্রাইড অভ কোল্ডা। ফেঁসে গেলাম আমি। ধরা দিলাম ক্যাপ্টেনের কাছে। প্রথমে খুব রাগারাগি করলেও পরে নরম হলো লোকটা। সাফ বলে দিল, আফ্রিকার মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে নেমে যেতে হবে আমাকে। নইলে পুলিসে ধরিয়ে দেবে।

নৌ বিহারটা মন্দ হলো না। কোনও কাজকর্ম নেই। সারাদিন জাহাজে ঘুরে বেড়ানো। এর ওর সাথে গুলতানি মারা। এভাবে মালাক্ভা প্রণালী 'পার হয়ে ভারত মহাসাগরে পড়লাম আমরা। বিশাল সাগর পাড়ি দেবার সময় খুব খাতির হয়ে গেল কেনিয়ার এক নাবিকের সঙ্গে।

লোকটা খুব হাসিখুশি আর আড্ডাবাজ। অবসর সময়ে আমার সঙ্গে তাস পিটত। জাহাজের ভাড়া না লাগলেও খাবার খরচ দিতে হত। বেশ কিছু ডলার বেরিয়ে গেল এইভাবে। হাত প্রায় খালি। এমন সময় জাহাজ ভিড়ল কেনিয়ার মোম্বাসা বন্দরে।

ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছিল জোলো উবাংগি। আমাকেও দাওয়াত দিল তার সঙ্গে যাবার জন্যে। দাওয়াত কবুল না করে উপায় ছিল না। আমি তখন পথের ফকির। রওনা হয়ে গেলাম ওর সঙ্গে ওদের বাড়ির উদ্দেশে।

এর আগে আফ্রিকা সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তা ভাঙতে শুরু করল। দেখলাম ওদের অবস্থা আমাদের চেয়ে ভাল। কেনিয়া দেশটাও খুব সুন্দর।

তানা নদীর তীরে গারিসা শহরে উপস্থিত হলাম আমরা।

এখান থেকে বাইশ মাইল দূরের এক গ্রামে জুলু উবাংগির বাড়ি। দশ মাইল গেলাম বাসে। বারো মাইল হেঁটে।

সে কী দুর্গম এলাকা। না দেখলে বিশ্বাস হবে না। চারদিকে ঘন জঙ্গল। মাঝে মাঝে লোকালয়। আর সাপের মত এঁকেবেঁকে ফুটছে পাহাড়ি নদী। বইতে পড়া আফ্রিকার আসল রূপটা দেখতে পেলাম উবাংগির গ্রামে।

মনে হলো যেন হাজার বছর ধরে এরা একই রকম রয়ে গেছে। শুধুমাত্র সাপ্তাহিক হাটের দিন বোঝা যায় সভ্য জগতের সাথে যোগাযোগ আছে এদের। বাইরের জিনিসপত্র কিছু কিছু পাওয়া যায় তখন।

উবাংগির বাপ-মা-ভাইবোন খুব যত্ন করল আমার। দেখলাম দু'এক লাইন ইংরেজীও বোঝে ওরা। ওদের সাথে কথা বলার সময় কুনটা কিনটের কথা মনে পড়ত। রুটস্ ছবিটা দেখেছিলাম টিভিতে।

আফ্রিকান সমাজের সবচেয়ে অন্ধকার দিক হলো ওদের ভূতপ্রেত আর যাদুটোনায় বিশ্বাস। এ ব্যাপারে ধর্ম যাই হোক না কেন সবারই প্রবল আস্থা।

আর যে রকম প্রাচীন জীবন ব্যবস্থা তাতে এসব থাকারই কথা। উবাংগির কাছেই শুনলাম ওদের এই গ্রামে মাত্র নয়শো লোক বাস করলেও সেখানে তুকতাক করতে পারে এমন গুনিনের সংখ্যা প্রায় তিরিশজন।

এসব গুনিনদের খুব কদর। একদিন দেখলাম উবাংগির বাবা তাদের বাড়ির সামনের একটা পুরনো বাওবাব গাছ কেটে ফেলছে। কারণ জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ওর ডালে একটা জোরকা এসে বাসা বেঁধেছে,' উত্তর দিল উবাংগি।

'জোরকা?'

'পূর্ব পুরুষ বা গ্রামেরই কোনও মৃত লোকের আত্মা। যে গাছে বাসা বাঁধে সেই গাছকে পূজো দিতে হয়।'

'তা হলে কেটে ফেলছেন কেন?'

'এই জোরকাটা খারাপ। কোনও দেশী লোকের আত্মা নয়।'

'মানে?'

'কুনাভুতি গ্রামে আজ থেকে দেড়শো বছর আগে এসেছিল একজন সাদা মানুষ। আমিল তং। খুব বদ আর রাগী ছিল লোকটা। গ্রামের লোককে জ্বালিয়েছে নানাভাবে। খুনও করেছে কয়েকজনকে।

'শেষমেশ ওকে মারার জন্য লুকাভুর সাহায্য নেয় গ্রামের মুরুব্বীরা। ঠিকই মারা যায় লোকটা। স[illegible]া ভুগে পরাজিত হয় লুকাভুর কাছে। ওর আত্মাটা ফিরে[illegible]ছে। প্রতিশোধ নিতে চায়। আশ্রয় নিয়েছে ওই বাওবাব গাছে।'

কথা শেষ হলে উবাংগির দিকে ভাল করে তাকালাম। যা বলেছে তার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করে লোকটা।

এত শহর বন্দর ঘুরে দেশ দুনিয়া দেখেও তার প্রাচীন বিশ্বাসের জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারেনি উবাংগি।

খুব গম্ভীর মুখে শুনলাম উবাংগির গল্প। মনের ভাব গোপন রাখলাম। কেননা এটা ওদের ধর্মীয় বিশ্বাস। 'লুকাভুর ব্যাপারটা বুঝলাম না। একটু খুলে বলো।'

'আই টেক ইউ দেয়ার। ওয়ান ডে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, ম্যান,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে উত্তর দিল উবাংগি।

একটা জিনিস খুব ভালভাবেই টের পেলাম। যত আদিম অবস্থায়ই থাক না কেন এরা, এদের মুখে মুখে চালু আছে

কয়েকশো বছরের ইতিহাস। এক সময় এদের পূর্ব পুরুষেরা দূর সমুদ্রে যাতায়াত করত, সেসব কাহিনিও বলাবলি করে এরা।

তিনদিন পরে আমাকে ওই গ্রামের সবচেয়ে বড় গুনিনের কাছে নিয়ে গেল উবাংগি। গুণীর চেহারাটা ভয়ঙ্কর।

সারা মুখে ছোট ছোট পোড়া দাগ। সম্ভবত লোহার শলাকা দিয়ে ছ্যাঁক দেয়া হয়েছে ছোটবেলায়। মাথার চুলে কয়েকশো গিঁট। শরীরের উপরিভাগ খালি। কোমরে একটা কাপড়। হাঁটু পর্যন্ত উদোম পা। হাতে একটা লাঠি, তেল চকচক করছে।

গুনিন খুশি হলো, না ব্যাজার হলো, বুঝলাম না। লুকাস্তুর কথা শুনে চুপচাপ বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে দেশী ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'নাম কী অতিথির?'

নাম বললাম। তারপর জিজ্ঞেস করল কখনও সাপে কেটেছে কিনা। কাটেনি, জানালাম।

এটা ওটা জিজ্ঞেস করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গুনিন। ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল জঙ্গলের দিকে। খুব জোরে হাঁটতে পারে লোকটা। তাল রাখতে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠলাম আমরা।

ঠিক কী করতে যাচ্ছে গুনিন বুঝতে পারলাম না। একটু ভয় ভয় লাগছিল। তবে উবাংগি সাথে থাকায় ভরসা পাচ্ছিলাম। প্রায় আধা ঘণ্টা হাঁটার পর একটা ফাঁকা জায়গায় এলাম আমরা। অপ্রত্যাশিত একটা জিনিস দেখলাম সেখানে।

কাঠের তৈরি একটা ছোট্ট বাড়ি। একদম ইউরোপিয়ান কায়দায় বানানো। সম্ভবত দেড় দু'শো বছরের পুরনো। বাড়ির সামনের লনে কাঁটা গাছের ঝোপঝাড়।

বাড়িটার চেহারা ধূলিমলিন। বোঝা যায় শত বছরেও এর

কোনও সংস্কার হয়নি। আশপাশের গাছপালা কেটে কোনওমতে পরিষ্কার রাখা হয়েছে।

অবাক হলাম এই দৃশ্য দেখে। কোনও কিছু জিজ্ঞেস না করতে ইশারা করল উবাংগি। ঘরের ধুলোমলিন মাকড়সার জালে ঢাকা দরজাটা খুলল গুনিন। ভেতরে আদিম অন্ধকার। একটা জানালা খুলে দিল।

বহু বছরের আটকা পড়া বন্দী বাতাস ছুটাছুটি শুরু করল। গুমোট ভাবটা কেটে গেল। কাঠের দেয়ালে আটকানো অনেক হরিণের শিং, বাঘের চামড়া, সরীসৃপের চামড়া ইত্যাদি। মানুষের মাথার খুলিও আছে একটা।

কেমন একটা হিংস্র আবহাওয়া ঘরের মধ্যে। ঠিক মাঝখানে একটা কবর। খুব ভারি কাঠের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। মাথার দিকে আবলুশ কাঠের একটা হেডস্টোন। কালো কাঠের উপর খোদাই করা কালো অক্ষর।

মাথা ঝুঁকিয়ে পড়তে লাগলাম আমি। পরিষ্কার ইংরেজী অক্ষর।

'দিস ইজ দা গ্রেভ অভ জোনাথান হ্যামিলটন হু ফেল ইন লাভ উইথ আফ্রিকা অ্যান্ড ভাইভ হিয়ার আনমোর্নড অভ এন আননোন জাঙ্গল। ডিসিসড্ ইন এইটিন ফিফটি এইট ইন দি ইয়ার অভ আওয়ার লর্ড।'

'এটাই তা হলে সেই আমিল তং সাহেবের কবর?'

'হ্যাঁ। ওর মৃত্যুর পরেও কিছুদিন সাদা চামড়ার লোকজন ছিল এখানে। হাতির দাঁতের ব্যবসা করত। বিশ ত্রিশ বছর পরে নাকি সবাই সরে পড়ে এখান থেকে।'

লক্ষ করলাম বাড়িটা থেকে কয়েকশো ফুট দূরে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে একটা সরু নদী। স্রোত থাকলেও

নৌকা চলবে। এটাই বোধহয় ছিল সাদা চামড়াদের যাতায়াতের পথ।

'তানা নদীর শাখা এটা। পাকা মাঝিরা নৌকা বেয়ে চলাচল করত এই পথে।'

'বন্ধ হলো কেন রাস্তাটা?'

'লুকান্ডুর ভয়ে এই পথটা বন্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া পায়ে হাঁটলে আরও তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়।'

পাশের রুম থেকে কাপড়ে মোড়ানো কিছু একটা নিয়ে এল গুনিন। দেখলাম লোকটার দুই চোখ ভয়ে শ্রদ্ধায় বন্ধ। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে।

উবাংগির হাতে দিল জিনিসটা। খুব যত্নের সঙ্গে আস্তে আস্তে কাপড়ের ভাঁজ খুলতে লাগল উবাংগি। আমরা যেভাবে ভক্তির সঙ্গে মাজারের তবারকের প্যাকেট খুলি।

এটা আবার কী? চমকে উঠলাম আমি। ভয়ে শিরশির করতে লাগল আমার পেটের ভেতরটা।

কাপড়ের ভাঁজ খুলে একটা ছোট মাথা বের করেছে উবাংগি। মানুষের মাথা। ভয়ানকভাবে কুঁচকে যাওয়া চামড়া। দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। শুকনো চোখ দুটোয় কী এক জান্তব বিদ্বেষ। মাথার চুলগুলো খুব ছোট এবং কোঁকড়ানো। বয়স্ক লোকের মাথা ঠিকই, তবে সাইজে একটা মাঝারি কদবেলের মত।

গা শিউরে উঠল আমার। কী এটা! মমি? এত ছোট কেন? আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারল উবাংগি।

'লুকান্ডু!' ফিসফিস করে বলল সে।

ভয় পেলেও হাতে নেবার কৌতূহল সামলাতে পারলাম না। নিলাম। গা কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠল।

হাতে নিয়েই ছেড়ে দিলাম মাথাটা। কেমন ঘেন্না লাগল। হায় হায় করে উঠল উবাংগি। গুনিনের দিকে তাকিয়ে দেখি ভয় পেয়েছে সেও।

উপুড় হয়ে তাড়াতাড়ি মাথাটা তুলল উবাংগি। ধুলো ঝাড়ল পরম আদরে। আবার ওটাকে কাপড় দিয়ে পেঁচাতে লাগল সস্নেহে।

চোখ দুটোর দিকে চাইলাম আমি শেষবারের মত। রাগে জীবন্ত দেখাচ্ছে। মনে হলো যেন নড়ল একবার।

তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিল উবাংগি মাথাটা। গুনিন খুবই বিরক্ত হয়েছে। উবাংগিকে কিছু একটা বলল সে অত্যন্ত অসন্তুষ্টির সঙ্গে।

'লুকান্ডুর অপমান হয়েছে। প্রতিশোধ নেবে সে,' অসহায় ভাবে বলল উবাংগি।

বলবার মত কিছু খুঁজে পেলাম না আমি।

'আমারই ভুল হয়েছে। আগেই সাবধান করা উচিত ছিল তোমাকে। খুব রাগী দেবতা লুকান্ডু।'

'মুখ কালো করে ফিরে এলাম আমরা।'

'আজ রাতেই চলে যাব আমরা,' বলল উবাংগি।

'কেন?'

'লুকান্ডুর ভয়ে কেউ সহজে মিশতে চাইবে না তোমার সাথে। গুনিনও ব্যাপারটা আরও ঘোলা করবে। আমি ওর ভাইপো বলেই সে রাজি হয়েছিল তোমাকে নিয়ে ওখানে যেতে। নইলে গত বিশ বছরে কেউ যায়নি ওই এলাকায়। শুধু গুনিন ছাড়া।'

'আমি বোধহয় তোমাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারলাম না। না?'

'ডোন্ট ওরি, ম্যান। ইউ বি কেয়ারফুল। ইফ লুকান্ডু অ্যাটাক, ইউ ফিভার। আফটার সেভেন উইক, ইউ ডাই। আই গিভ ইউ মেডিসিন।'

কয়েকটা গাছের শেকড় আর সিংহের হাড়ের গুঁড়ো নিয়ে সেদিন রাতেই কুনাভুতি ছাড়লাম আমরা। নিজের সঞ্চয় থেকে আমাকে পঞ্চাশ ডলার দিয়ে দিল উবাংগি। মোম্বাসা এসে আমাকে একটা ফিলিপাইনী জাহাজে কাজ জুটিয়ে দিল সে। খুবই উদার হৃদয় ছিল ওর। তারপর আমাকে জাহাজে রেখে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

তারপরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। ফিলিপাইনী জাহাজ এ বন্দর সে বন্দর ঘুরে ফিরে এল কলম্বোয়। কেটে গেল সুদীর্ঘ চার বছর।

কেনিয়ার কুনাভুতি গ্রামের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। একদিন সুটকেস নাড়াচাড়া করতে গিয়ে পেলাম উবাংগির দেয়া সেই শেকড় বাকড়ের প্যাকেট। পুরনো ঘটনাগুলো মনে পড়ল।

হাসি পেল সেদিনের সেই আতঙ্কের কথা মনে করে। প্যাকেটটা ফেলে দিলাম বন্দরের ঘোলা জলে।

সে রাতেই স্বপ্ন দেখলাম লুকান্ডুকে। সকাল থেকে জ্বর শুরু হলো। ওষুধপত্র খেয়ে জ্বর কমল ঠিকই কিন্তু গভীর রাতে আসত জ্বর, আর সেই সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা সারা গায়ে। পাঁচ সপ্তাহের মাথায় বাড়ি ফিরে এলাম।

গল্প শেষ হলো আলী চাচার। আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। সাত সপ্তাহের হিসাবটা মনে রেখেছি ঠিকই। চাচা ফিরেছেন পাঁচ সপ্তাহের মাথায়। আরও এক সপ্তাহ চলে গেল। তা হলে কি এই সপ্তাহেই মারা যাবেন আলী চাচা?

ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। আরও তিনদিন একই রকম গুম মেরে রইলেন চাচা। বাড়ির লোকেরাও কেমন আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে সবাই। মুখ ফুটে কেউ বলতে সাহস পাচ্ছে না মনের কথাটা।

সাত সপ্তাহ যেতে আর দু'দিন বাকি। আলী চাচা কেমন যেন খ্যাপাটে হয়ে উঠলেন এরই মধ্যে। রাতের বেলা বিড়বিড় করে কীসব বকেন। কৌতূহল ধরে রাখতে পারলাম না আমি। জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম চাচার রুমে।

রাত তখন দুটো। বিছানায় অনবরত গড়াগড়ি খাচ্ছেন চাচা। সারা গা চুলকাচ্ছেন। খালি গা লাল হয়ে উঠেছে খামচির আঘাতে। হঠাৎ দেখলাম চুপ হয়ে গেলেন চাচা।

বিড়বিড় করে কিছু একটা বললেন। শুধু একটা শব্দ বোঝা গেল। লুকান্ডু।

নিজের ঘরে রাতের বেলা কাউকে থাকতে দিতেন না চাচা। নইলে মুরুব্বীদের ইচ্ছা ছিল কেউ একজন থাকুক অসুস্থ মানুষটার সঙ্গে। জ্বরের ঘোরে একা একা প্রলাপ বকতে লাগলেন চাচা।

আমার খুব মায়া হলো। এ সমস্ত প্রাচীন অভিশাপের কথা আগেও শুনেছি। পিরামিডের আমনরা-র অভিশাপের কাহিনি তো জগদ্বিখ্যাত।

হঠাৎ ভয় পেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম আমি। চাচার খাটটা দুলতে লাগল ঘরের মধ্যে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেলেন মানুষটা।

চাচার হাত পা বুকে পিঠে চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য ছোট ছোট মাথা। কুচকুচে কালো মুখঅলা কদবেল সাইজের অসংখ্য মাথা। সাদা দাঁত বের করে প্রচণ্ড

রাগে চেঁচামেচি করতে লাগল হিংসায় বিকৃত হয়ে যাওয়া মুখগুলো। তাদের চোখে সে কী ক্রোধ।

চাচার সারা শরীরে কিলবিল করছে মাথাগুলো আর চিঁচিঁ করে শাসাচ্ছে। ভয় দেখাচ্ছে।

পাগলের মত লাফিয়ে উঠলেন চাচা। টেবিলের উপর থেকে কাগজ কাটা ছুরি নিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করলেন মাথাগুলো কেটে ফেলতে।

মাত্র একটি মাথা গলার কাছ থেকে কাটতে পারলেন। ধপ্ করে বিছানায় পড়ল সেটা।

বাকিগুলোর চিৎকার আর শাসানির ফলে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না চাচা। ঘৃণায়, ক্রোধে আর ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠল চাচার মুখ। পাগলের মত নিজের গায়ে ছুরি চালাতে লাগলেন।

ঘরভর্তি রক্তের নদীতে ভাসতে লাগলেন আলী চাচা। সকাল হবার আগেই রাত সাড়ে তিনটার দিকে মারা গেলেন তিনি। প্রতিশোধ ঠিকই নিল লুকান্ডু। আচ্ছন্নের মত নিজের ঘরে ফিরলাম। কাউকে ডাকলাম না।

সকাল বেলা সবাই আবিষ্কার করল চাচার মৃতদেহ। কদবেলের মত মাথাগুলো উধাও হয়েছে।

একমাত্র কাটা মাথাটা সবার অজান্তে পড়েছিল খাটের কোনায়, কেউ লক্ষ করার আগেই চুপিচুপি বিছানা থেকে উঠিয়ে নিলাম আমি, ভয়ে আমার শরীর তখনও থর থর করে কাঁপছে। কাপড়ে পেঁচিয়ে পড়ার ঘরের আলমারিতে উঠিয়ে রাখলাম সেটা।

সেই ভয়াল রাতের স্মৃতি মনে পড়লে আজও আমার বুক কাঁপে। আর আলী চাচার দুর্ভাগ্যের কথা মনে হলে মনটা

খারাপ হয়ে যায়।

পড়ার ঘরের আলমারিতে এখনও আছে সেই কাপড়ে পেঁচানো পুঁটলি। খুলে দেখার সাহস হয়নি আমার।

যদি আপনারা কেউ দেখতে চান, যদি লুকাভুর অভিশাপের ভয় না করেন তা হলে যে কোনওদিন চলে আসতে পারেন লৌহজং উপজেলার হলদিয়া গ্রামের রমজান ঢালীর বাড়িতে। আমি ওখানেই থাকি।

কবির আশরাফ

মুণ্ডহীন প্রেত

বাড়িটি দেখে হতাশ হলো তৃষা। অবহেলিত, পরিত্যক্ত লাগছে প্রকাণ্ড বাড়িটি। জানালার কাঁচ দু'এক জায়গায় ভাঙা। দেয়ালের প্লাস্টার উঠে আছে কোথাও কোথাও। ভেতরের অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনও। যেন শুরু করেছিল কেউ, তাড়াহুড়োর কারণে শেষ করে যেতে পারেনি। বাড়ির পেছনে আবার জঙ্গলও আছে। অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে গা কেমন ছমছম করে উঠল তৃষার। লম্বা লম্বা গাছ ছায়া ফেলেছে দোতলা বাড়িতে। সূর্যের আলো ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। ফলে ঘরগুলো ছায়াময়, অন্ধকার। তৃষার মনে হলো ঘরগুলোতে গোপন কী এক রহস্য লুকিয়ে আছে।

বাড়ির চেহারা দেখে হতাশ বাবা মাও। অবশ্য বাবার কিছু করার ছিল না। ঘুষখোর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পথের কাঁটা দূর করতে এক দিনের নোটিশে বাবাকে এ শহরে বদলি করে দিয়েছে। সরকারি কোয়ার্টার্স পেতে দেরী হবে। বাবার অফিসের এক সহকর্মীর এক আত্মীয় থাকে এ শহরে। কলিগ ভদ্রলোক তার আত্মীয়কে ফোন করে তৃষার বাবার আবাসন সমস্যার কথা জানালে এ বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছে সে। ভাড়া বাড়ি। বাড়ির মালিক বিদেশে। কলিগের আত্মীয় এ

বাড়ির কেয়ারটেকার। তবে বাড়ির যে তেমন 'কেয়ার' সে নেয় না, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। বাড়ির চাবি সোবহান সাহেবের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে সে লাপাত্তা।

এখানে সন্ধ্যা নামে খুব দ্রুত। যেন ঝপ করে ঘোমটা ফেলল রাত। রাতে, পুরানো ডাইনিং টেবিলে খেতে বসল তৃষা শুকনো মুখে। ওদের মালপত্র ঢাকা থেকে এখনও এসে পৌঁছায়নি। তবে এ বাড়িতে খাট-পালংক সবই আছে দেখে অবাক হয়েছে সে। কেয়ারটেকার জানিয়েছে আগের ভাড়াটে তাদের আসবাব ফেলে রেখে নাকি চলে গেছে। কেন গেছে এ প্রশ্নের সদুত্তর মেলেনি তার কাছে। বিড়বিড় করে কী বলেছে বোঝা যায়নি। কেটে পড়েছে লোকটা এবং যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

'এত মন খারাপ করে থাকতে হবে না,' মেয়ের শুকনো মুখ দেখে বললেন বাবা। 'এখানে কয়েকদিনের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবি তুই। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। তাজা বাতাস টানতে পারবি বুক ভরে। ঢাকার মত দূষিত বায়ু দিয়ে আর ফুসফুস ভরাতে হবে না। স্কুলে ভর্তি করে দেব তোকে আগামী হপ্তায়। বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে নিবি। দেখবি ঠিক হয়ে গেছে সব।'

বিদ্যুৎ নেই। মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলোয় বাবাকে দেখল তৃষা। কী করে বাবাকে বোঝাবে এ বাড়ি ওর মোটেই পছন্দ হয়নি। কুডাক ডাকছে মন। এখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে।

'ঠিকমত খাও, মা,' নরম গলায় বললেন মা। 'তারপর একটা ঘুম দাও। ঝরঝরে হয়ে যাবে শরীর। শারীরিক ক্লান্তি দূর হয়ে গেলে মনও ভাল হয়ে যাবে।'

আয়োজন খুব সামান্য। খিচুড়ি আর ডিম ভাজা। আজই ওরা এসে পৌঁছেছে। বাবা বাজার করার সুযোগ পাননি। তবে মা'র হাতের খিচুড়ির কোনও তুলনাই হয় না। কিন্তু আজ খেতে ভাল্লাগছে না তৃষার। বাবা-মা রাগ করবেন, এ ভয়ে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রাস তুলছে মুখে। তাকিয়ে আছে জানালার দিকে। জানালার ওপাশে জঙ্গলটাকে দেখা যাচ্ছে। মোমের শিখা কাঁচের গায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। ছোট ছোট সোনালি চোখের মত দেখাচ্ছে।

ডাইনিং রুম থেকে জঙ্গল এবং আকাশ দুটোই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তৃষা। হঠাৎ একটা কাঠামো চোখে পড়ল ওর। ওই তো এক গাছ থেকে চলে গেল আরেক গাছের আড়ালে। খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল তৃষার। তাকিয়ে আছে। আবার নড়ে উঠল ওটা। প্রথমে কোনও বড় প্রাণী ভেবেছিল তৃষা। শহরের শেষ প্রান্তের এ জঙ্গলে উদ্‌বিড়াল টাইপের জানোয়ার থাকা বিচিত্র নয়, বাবা বলেছেন ওকে। তবে ওটা জন্তু-জানোয়ার নয়। মানুষ। বাড়ির দিকে হেঁটে আসছে সাদা শাড়ি পরা এক মহিলা। সোজা জানালা লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। জঙ্গলের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল সে। ভয়ানক আঁতকে উঠল তৃষা। মহিলাই বটে। তবে মহিলার ধড়ের উপর কিছু নেই। মুণ্ডুহীন একটা মানুষ।

আঁ আঁ করে চিৎকার দিল তৃষা। বাবা-মা চমকে তাকালেন ওর দিকে। 'ভূ-ভূত!' জানালার দিকে আঙুল দেখাচ্ছে তৃষা। বাবা-মা দৌড়ে গেলেন জানালার সামনে। কিন্তু তার আগেই রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেছে মুণ্ডুহীন প্রেত।

তৃষা টেবিলে বসে থরথর করে কাঁপছে ভয়ে।

'আমি দেখেছি' কাঁদতে কাঁদতে বলল ও। 'এক মহিলা।

মাথা নেই।'

বাবা জানালার সামনে থেকে ফিরে এলেন। জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। মা'র সঙ্গে চাওয়াচাওয়ি করলেন। তাদের দৃষ্টি বিনিময় দেখে বুঝতে পারল তৃষা ওর কথা বিশ্বাস করেননি ওঁরা।

সরু তাকের সিঁড়ি মাড়িয়ে দোতলায় নিজের শোবার ঘরে চলে এল তৃষা। হাতে প্রিয় লেখকের হরর গল্প সংকলন। বিদ্যুৎ আসেনি এখনও। মা মোম জ্বালিয়ে রেখে গেছেন। অদ্ভুত ঘরটির চারপাশে চোখ বুলাল তৃষা। এ ঘরের দেয়ালে ওয়াল পেপার লাগানো। তবে অযত্নে জীর্ণ ওয়াল পেপার। জানালায় পর্দা নেই। ওদের মালপত্রের ট্রাক পৌঁছে গেলেই জানালার পর্দা লাগিয়ে দেবেন বলেছেন মা। তবে ট্রাক কবে পৌঁছুবে তার ঠিক নেই। কারণ সাভারে এক ট্রাক ড্রাইভার চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় এক পুলিশ সার্জেন্ট তাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে। ট্রাক ড্রাইভারদের সংগঠন ওই সার্জেন্টের শাস্তি এবং অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম ট্রাক ধর্মঘট ডেকেছে। অবশ্য তৃষাদের তেমন সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। কারণ আগের ভাড়াটেরা তাদের জিনিসপত্র নিয়ে যায়নি বলে আপাতত ওগুলো দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে তৃষারা।

বিছানায় উঠে পড়ল তৃষা। পড়তে লাগল বই। বইয়ের জগতে ডুবে গেলে পারিপার্শ্বিকতা সব ভুলে যায় তৃষা। ঘণ্টাখানেক পর ওর মা এলেন ঘরে। ওর পাশে বসলেন। এটাসেটা নিয়ে গল্প করলেন কিছুক্ষণ। তারপর মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে সিধে হলেন। 'ঘুমিয়ে পড়ো, মা। আর পড়তে হবে না। নতুন জায়গায় প্রথম প্রথম একটু অস্বস্তি লাগবে। তারপর

ঠিক হয়ে যাবে সব।' ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নেভালেন তিনি। চলে গেলেন।

চোখ বুজল তৃষা। ঘুমাবার চেষ্টা করল। হঠাৎ শাঁ শাঁ আওয়াজে চমকে উঠল। চাইল চোখ মেলে। জানালার বাইরে উদ্বাহু নৃত্য শুরু করে দিয়েছে গাছপালা। ঝড় শুরু হয়েছে। আশ্বিনের ঝড়। আর্তনাদ ছাড়ছে বাতাস; বাড়ি খাচ্ছে তৃষাদের বাড়ির দেয়ালে। গাছের ডাল বাড়ি খাচ্ছে ছাদে। বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে ঠকঠক একটা শব্দ প্রকট হয়ে বাজল কানে। তৃষার ঘরের শেষ মাথার জানালা দিয়ে আসছে শব্দটা। নিশ্চয় গাছের ডাল বাড়ি খাচ্ছে তাই এমন আওয়াজ হচ্ছে, নিজেকে বোঝাল তৃষা।

কিন্তু ঠকঠক শব্দটা থামল না। শেষে আর সহ্য করতে পারল না তৃষা। মস্তিষ্কে বাড়ি মারছে আওয়াজ। বিছানা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে পড়ল ও। পা টিপে টিপে এগোল জানালার দিকে। আকাশে ফকফকা চাঁদ। চাঁদের রূপোলি আলোয় দেখল ও যা ভেবেছিল ঠিক তাই। বাতাসে একটা গাছের ডাল বাড়ি খাচ্ছে জানালার কাচে। শব্দ উঠছে ঠকঠক। ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তৃষা। তাকাল নীচে। পর মুহূর্তে হিম হয়ে গেল বুকের রক্ত।

ওর জানালার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে আছে মুণ্ডুহীন সেই প্রেত। হাত উঁচিয়ে রেখেছে সে যেন ধরে ফেলবে তৃষাকে। তার ধড়ের উপর রক্তাক্ত একটা পিণ্ড ছাড়া কিছু নেই।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল তৃষা, এক দৌড়ে চলে এল বিছানায়। হাঁ করা গলা থেকে একের পর এক চিৎকার বেরিয়ে আসছে। বাবা মা ছুটে এলেন মেয়ের চিৎকার শুনে। সুইচ টিপে বাতি জ্বালালেন।

'ওই মহিলা আবার,' ফোঁপাচ্ছে তৃষা। 'মুণ্ডুহীন সেই মহিলা। ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার জানালার ঠিক নীচে।'

বাবা-মা ছুটে গেলেন জানালার সামনে। তাকালেন নীচে। বাতাসে নৃত্যরত গাছ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না তাদের।

'তৃষা, তুমি এখন বড় হয়েছ,' বাবা ফিরে এলেন মেয়ের কাছে। 'ভূতের ভয় পাবার বয়স তোমার নেই।' বালিশের পাশ থেকে হরর বইটা তুলে নিলেন তিনি গম্ভীর মুখে। 'এসব ছাইপাশ পড়তে নিষেধ করেছি না তোমাকে?' সিধে হলেন তিনি বই হাতে, নিভিয়ে দিলেন বাতি। আর একটিও কথা না বলে চলে গেলেন মাকে নিয়ে। মা মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলেন, বাবার ভয়ে পারলেন না।

মাথার উপর চাদর টেনে দিল তৃষা। অন্ধকারে কাঁদছে। বাবার উপর রাগ হচ্ছে খুব। ওর বয়স এমন কিছু নয়– দু'মাস হলো চোদ্দতে পা দিয়েছে। চোদ্দ বছরের মেয়েদের কি ভূতের ভয় পাওয়া নিষেধ? আর সে তো হরর বই পড়ে ভয় পায়নি, সত্যি সত্যি ভূত দেখেছে। কিন্তু বাবা-মাকে এ কথা কীভাবে বিশ্বাস করাবে তৃষা? পিশাচিনীর কথা ভাবতে ভাবতে আর কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তৃষা।

পরদিন ভোরে একগাদা বাজার করে নিয়ে এলেন সোবহান সাহেব। মাকে সাংসারিক কাজে সাহায্য করতে লাগল তৃষা। দিনের আলোয় কেটে গেছে ভয়। বরং গত রাতের ঘটনাটার কথা এখন বিশ্বাস হতে চাইছে না। মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা ছিল কল্পনা।

বাবা ন'টার দিকে চলে গেলেন অফিসে। মা রান্নাঘরে ব্যস্ত, সদর দরজার কলিংবেল বাজাল কেউ। 'আমি দেখছি' বলে সব্জির ঝুড়ি সরিয়ে খাড়া হলো তৃষা। গিয়ে দরজা খুলল। ফর্সা

এক মহিলা, মাথা ভর্তি লাল চুল, লাল টকটকে লিপস্টিক চর্চিত ঠোঁটে হাসলেন তৃষার দিকে তাকিয়ে। 'তোমরা এ বাড়িতে নতুন এসেছ, না?'

মাথা ঝাঁকাল তৃষা। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মহিলার দিকে।

'আমি মিসেস রোজী অগাস্টিন। এখানকার একটা কিন্ডারগার্টেনে পড়াই। তোমার মা আছেন বাড়িতে?'

আবারও মাথা ঝাঁকাল তৃষা। পেছন থেকে বলে উঠলেন মা, 'কে রে, তৃষা?' দেখতে এসেছেন কার সঙ্গে কথা বলছে তাঁর মেয়ে।

মিসেস রোজী অগাস্টিন অত্যন্ত বাচাল প্রকৃতির মহিলা। বকবক করে কানের পোকা নড়িয়ে দিলেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার জীবন ইতিহাস জেনে ফেলল তৃষা। জানল মিসেস রোজী অগাস্টিন বিধবা, তার স্কুলে বেবী-সিটিং-এর ব্যবস্থাও করেছেন। কর্মজীবী মায়েরা বাচ্চাদের নির্ভাবনায় তার স্কুলে রেখে যায়। প্রয়োজন হলে তিনি মাঝে মাঝে তৃষাকে এসে সঙ্গ দিয়ে যাবেন। শুনে মা কৃতজ্ঞ বোধ করলেও খুশি হতে পারল না তৃষা। কারণ প্রথম দর্শনেই মহিলাকে অপছন্দ হয়েছে তার। বাচাল মানুষ একেবারেই সইতে পারে না সে। বছরের ছ'মাস পার হয়ে যাওয়ার পরেও এখানকার বেসরকারী গার্লস স্কুলে যাতে তৃষা ভর্তি হতে পারে সে ব্যাপারে সর্বতো সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় হলেন মিসেস রোজী অগাস্টিন। যাওয়ার আগে এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলেন তৃষার দিকে তাকিয়ে, গা শিরশির করে উঠল ওর।

মালপত্রের ট্রাক কবে আসে ঠিক নেই. মা বিকেলে তৃষাকে

নিয়ে শহরে গেলেন। সংসারের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কিনলেন। আর তৃষা কিনল বই। ছিমছাম, ছোট এ শহরে দুটো বইয়ের দোকান। তাদের কালেকশন খারাপ না। যে সব বই স্টকে নেই, অর্ডার দিলে ঢাকা থেকে আনিয়ে দেয়। তৃষা অবশ্য পছন্দের বই'ই শুধু কিনল না, ক্লাসের বইও কিনতে হলো।

কেনা কাটা করে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। বাবা তখনও ফেরেননি অফিস থেকে। রিকশা থেকে মালপত্র নামাল তৃষারা। মা কিছু জিনিস নিলেন, বাকিগুলো বহন করল তৃষা।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে মনে পড়ল লেটেস্ট কিশোর ক্লাসিকের বই দুটো সে দোকানে রেখে এসেছে। নিজের উপর রাগ হলো তৃষার। এখন আবার দোকানে ছুটতে হবে। কাল গেলেও হয়। কিন্তু কাল শুক্রবার। মার্কেট বন্ধ। নাহ্, বইদুটো এখনই চাই ওর। নতুন বই বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে পড়তে না পারলে ঘুম হয় না তৃষার। সে মাকে বই রেখে আসার কথা বলল। জানাল রিকশা নিয়ে সে মার্কেটে যাবে আর আসবে। যে রিকশা করে ওরা এসেছিল সে রিকশাঅলাকে তখনও ভাড়া দেয়া হয়নি। তৃষা মা'র কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে ওই রিকশায় উঠে পড়ল আবার। মা সঙ্গে আসতে চাইলেন। নিষেধ করল তৃষা। এই রিকশাতেই সে ফিরবে। কাজেই দুশ্চিন্তা করতে হবে না মাকে। নিরাপদেই ফিরবে।

কিন্তু নিরাপদে ফিরতে পারল না তৃষা। বাড়ি থেকে প্রায় শ খানেক গজ দূরে যখন সে, রিকশার একটা চাকা হঠাৎ পাংচার হয়ে গেল। তৃষা রিকশাঅলাকে ভাড়া দিয়ে হাঁটা দিল বাড়ির উদ্দেশে। বুকে ধরে আছে বই। ওই তো ওদের বাড়ি।

চাঁদের আলোয় সাদা রঙের বাড়িটাকে ম্লান দেখাচ্ছে। এই প্রথম লক্ষ করল তৃষা ওদের বাড়িতে অসংখ্য জানালা। এত বেশী জানালা যে ওগুলো ঠিকমত বন্ধ করে না রাখলে যে কেউ ঢুকে পড়তে পারবে ঘরে। ভাবনাটা শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দিল তৃষার। অজান্তে বেড়ে গেল হাঁটার গতি।

আর ঠিক তখন, রাস্তার পাশের ঘন গাছের আড়াল থেকে গাঢ় একটা ছায়া বেরিয়ে এল। এক জোড়া হাত জড়িয়ে ধরল ওকে। বরফ ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে ছ্যাঁৎ করে উঠল গা। সেই মুণ্ডুহীন প্রেত!

গলা দিয়ে তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে এল তৃষার। শরীরে ঝাঁকি দিয়ে বন্ধন মুক্ত হলো। পরমুহূর্তে আবার হাত জোড়া ছুটে এল ওকে ধরার জন্য। দৌড়াল তৃষা। অল্পের জন্য মিস হলো টার্গেট। ধরতে পারল না ওকে পৈশাচিক হাত জোড়া। হিস্টিরিয়া রোগীর মত ফোঁপাতে ফোঁপাতে, ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে পড়ল তৃষা। মাকে ডাকছে।

'আবার সে।' কাঁদতে কাঁদতে বলল তৃষা। 'সে-ই মুণ্ডুহীন প্রেত। আমাকে ধরার চেষ্টা করছিল।'

মা সান্ত্বনা দিলেন ওকে। বোঝানোর চেষ্টা করলেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাবা অফিস থেকে ফেরার পর তাঁকে আজকের ঘটনা বললেন মা। বাবা গম্ভীর মুখে সব শুনলেন। আজ আর মেয়ের উপর রাগ করলেন না। বরং মায়া হলো মেয়ের জন্য। মেয়েটা যখন বারবার ভয় পাচ্ছে, এ বাড়িতে না থাকাই ভাল। সিদ্ধান্ত নিলেন কাল, ছুটির দিনে নতুন বাড়ি খুঁজতে বেরুবেন।

পরদিন বিকেলে বাবা-মা বাড়ি খুঁজতে বেরুলেন। তৃষা গেল না। সে ক্ল্যাসিকে মশগুল। তা ছাড়া বাবা-মা সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবেন। সে ততক্ষণ একা থাকতে পারবে।

ঘণ্টাখানেক পর বেজে উঠল কলিংবেল। দোতলা থেকে নেমে এল তৃষা। দরজা খুলল। অন্ধকার ঘনাল চেহারায়। নাহ্, বাবা-মা ফেরেননি, মিসেস রোজী অগাস্টিন।

'মা বাড়ি নেই,' দরজা আগলে রেখে বলল তৃষা।

'জানি,' হাসলেন লালচুলো মহিলা। 'তোমার বাবা-মা বাসা খুঁজতে গেছেন। রাস্তায় দেখা হলো। তোমার মা বললেন তুমি বাড়িতে একা। আবার ভয়-টয় পাও কিনা। অনুরোধ করলেন তোমাকে যেন একটু সঙ্গ দিই।' তৃষার বলতে ইচ্ছে করল সে ভয় পাবে না এবং এ মুহূর্তে কারও সঙ্গ তার দরকার নেই। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই মহিলা তাকে একরকম ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। এগোলেন ড্রইংরুমের দিকে। তৃষাকেও তার পেছন পেছন যেতে হলো।

মহিলা ড্রইংরুমে বসলেন না। একের পর এক ঘরে ঢুকলেন এমন ভঙ্গিতে যেন তার সব কিছু চেনা। 'আপনি এ বাড়িতে আগে কখনও এসেছেন?' জিজ্ঞেস করল তৃষা।

'আমরা তো এ বাড়িতেই থাকতাম,' আবছা গলায় জবাব দিলেন মিসেস রোজী অগাস্টিন। 'আমার স্বামীর মৃত্যুর পরে চলে যাই এখান থেকে।'

'আপনারা যাবার পড়ে কারা থাকত এখানে?' জানতে চাইল তৃষা।

'এসেছিল দু'একজন। কিন্তু কেউ দুই এক হপ্তার বেশী থাকতে পারেনি,' হঠাৎ খনখনে গলায় হেসে উঠলেন মহিলা। গায়ে কাঁটা দিল তৃষার।

'কেন?' ঢোক গিলল তৃষা।

'তুমি ছোট মানুষ। শুনলে ভয় পাবে,' মিসেস অগাস্টিন স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন তৃষার দিকে।

'আমি ভয় পাব না।' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল তৃষা। 'আপনি বলুন না।'

দোয়া পড়ছেন মিসেস সোবহান। মুখ সাদা হয়ে গেছে তাঁর। সোবহান সাহেব তাড়া দিচ্ছেন রিকশাঅলাকে আরও জোরে চালানোর জন্য। কিন্তু জোরে চালাতে গিয়ে বারবার রিকশার চেইন পড়ে গেল। স্ত্রীকে নিয়ে রিকশা থেকে নেমে পড়লেন সোবহান সাহেব। রিকশাঅলার হাতে ক'টা টাকা গুঁজে প্রায় দৌড়াতে শুরু করলেন বাড়ির দিকে। এখান থেকে বাড়ি কমপক্ষে আধমাইল দূরে। ঠিক সময় পৌঁছুতে পারবেন তো বাড়িতে? তার আগে সর্বনাশ হয়ে যাবে না তো? শহরের একমাত্র কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে একটু আগে যা শুনে এসেছেন, বমি ঠেলে আসছে পেট থেকে। আল্লা, আমার মেয়েটাকে বাঁচাও...

বিছানায় শুয়ে আছে তৃষা। মনোযোগ দিতে পারছে না হাতে ধরা বইতে। ভয়ে কাঁপছে বুকের ভেতরটা। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে বাবা-মা যেন ফিরে আসেন এখুনি। এ বাড়ি নিয়ে নোংরা এবং ভয়ঙ্কর এক গল্প শুনিয়েছেন মিসেস রোজী অগাস্টিন। এক নৃশংস খুনের কাহিনি। এ বাড়িতে এক দম্পতি থাকত। পুরুষটা তার কিশোরী কাজের মেয়েটির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। পুরুষটার স্ত্রী এতে বাধা দিলে সে মহিলাকে জবাই করে হত্যা করে। তারপর কাজের মেয়েটাকে

নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এরপর থেকে এ বাড়ি প্রায় পোড়োবাড়ির মত হয়ে গেছে। কেউ এখানে এসে টিকতে পারে না। তারা কি মুণ্ডুহীন কোনও মহিলাকে দেখেছে? ভয়ে ভয়ে জানতে চেয়েছে তৃষা। জবাবে রহস্যময় হাসি হেসেছেন মিসেস রোজী অগাস্টিন, জবাব দেননি। তারপর একরকম জোর করে তৃষাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন গরম দুধ নিয়ে আসছেন তিনি তৃষার জন্য। কিন্তু তাও তো কুড়ি মিনিট হয়ে গেল। এখনও দুধ নিয়ে আসছেন না কেন মহিলা? একা থাকতে ভয় লাগছে তৃষার। সে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকছে। কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে গায়ে। জানালা বন্ধ করার জন্য ওদিকে পা বাড়াল তৃষা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দ্রুত। জানালা বন্ধ করতে গিয়ে চোখ চলে গেল নীচে। সঙ্গে সঙ্গে জমে বরফ হয়ে গেল ও। ওর জানালার নীচে পায়চারি করছে মুণ্ডুহীন প্রেত!

কাঁপতে কাঁপতে জানালার সামনে থেকে সরে এল তৃষা। মিসেস রোজী অগাস্টিনের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগল। চেঁচাতে চেঁচাতে ভেঙে গেল গলা। কিন্তু মহিলার কোনও সাড়া নেই। বেডরুমে থাকতে আর সাহস পাচ্ছে না তৃষা। উন্মাদের মত নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। একেকবারে দুটো করে ধাপ টপকাচ্ছে। এক ছুটে ঢুকে পড়ল ড্রইংরুমে। এখানে বসে গল্প করছিল ও মহিলার সঙ্গে।

ঘর খালি। চেয়ারে কেউ নেই। শুধু ঘরের মাঝখানে, টী টেবিলের উপর পড়ে আছে মিসেস রোজী অগাস্টিনের কাটা মুণ্ডুটা। লাল চুলোগুলো এলিয়ে পড়েছে টেবিলে। কালো চোখ জোড়ার স্থির দৃষ্টি তৃষার দিকে। লিপস্টিক মাখা পাতলা লাল ঠোঁট বেঁকে আছে বিদ্রূপের হাসিতে।

আর্তনাদ ছাড়ল তৃষা। ঘুরল। আবার দৌড় দিতে যাবে সিঁড়ির দিকে, দড়াম করে খুলে গেল সদর দরজা। মিসেস রোজী অগাস্টিনের মুণ্ডুহীন ধড় ঢুকল ঘরে। বড় বড় নখঅলা হাত জোড়া সামনের দিকে বাড়ানো। এগিয়ে আসতে লাগল সে ভয়ে পাথর হয়ে যাওয়া তৃষার দিকে।

অনীশ দাস অপু

কিংবদন্তী

সবুজ গাছপালা আর নদী-খাল-বিল দিয়ে ঘেরা সখিপুরে বিড়াল মারা নিষেধ। আগুনের পাশে যে বিড়ালটা বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে কথাটা আমার প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। তবে যুগ যুগ ধরে বিড়ালকে নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রচুর কিংবদন্তী। তা ছাড়া বিড়াল খুব রহস্যময় প্রাণী। বনের রাজা বাঘের সাথে এদের মিল আছে। স্ফিংসের পূর্বপুরুষ সে। সে নিজের ভাষায় কথা বলে– যা আমরা বুঝতে পারি না। বিড়ালটার দিকে তাকিয়ে আমার সারা শরীর অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল।

সখিপুর একটা আধুনিক থানা, তবে এটাকে গ্রামই বলা চলে। ইলেক্ট্রিসিটি আছে, তবে সেটা না থাকার মতই। তাই শীতকালে যখন হঠাৎ করে সূর্য ডুবে যায়, তখন আলো-আঁধারিতে যেন রহস্যময় প্রাণীরা ঘুরে বেড়ায়।

সখিপুরে বিড়াল মারা নিষেধ– এই নিয়মটা সবসময় ছিল না। নিয়মটা বিড়ালেরাই তৈরি করেছিল। কেন এবং কীভাবে, সেই ভয়াল কাহিনী এখানকার মানুষকে আজও আতঙ্কে দিশেহারা করে রাখে। এখানে যেন চলছে বিড়ালের রাজত্ব।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন বিড়াল ছিল, তবে তাদের দাপট ছিল না। যে সময়ের কথা বলছি, তখন বিড়াল বিড়ালই

ছিল, অন্য কিছু না।

গ্রামের এক জায়গায় একটা কুঁড়েঘর। তার চারপাশে ঘন ঝোপ-ঝাড়, পেছনে কয়েকটা পুকুর। এই কুঁড়েঘরে বাস করে এক বুড়ো লোক এবং তার স্ত্রী। গরীব ওরা– কোনওমতে দিন চলে। তবে কোনও কারণে ওরা বিড়াল সহ্য করতে পারত না। আবার রহস্যময় কারণে এখানেই দেখা যেত অনেক বিড়াল।

রাতের অন্ধকারে ওরা বিড়ালের জন্য ফাঁদ পেতে রাখত। বিড়াল ধরা পড়লে সেটাকে মেরে ফেলত ওরা। লাশটা ফেলে দিত পুকুরে। পুকুরে ভাসত মরা বিড়ালের শরীর। এভাবে ওরা বিড়াল ধরত আর মারত। দু'বেলা না খেতে পেলেও, প্রতিরাতে বিড়াল মারা চাই– এটা যেন ছিল ওদের কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন। রাতের অন্ধকারে বিড়ালের মরণচিৎকার বাতাস ভারী করে তুলত। তখন আশপাশে যারা ছিল, তারা মনে করত, বুড়ো-বুড়ি অস্বাভাবিকভাবেই বিড়ালগুলোকে মারত। এভাবে পুকুরটা ভরে গিয়েছিল মরা বিড়ালে। পচা শরীরগুলো থেকে ছড়িয়ে পড়ত প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। ফলে আশপাশের লোকজন তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাল। কারণ বুড়ো-বুড়িকে কেউ সাধারণ মানুষ মনে করত না, ভাবত পিশাচ-সাধক। বিড়ালের মরণচিৎকার আর তাদের পচা শরীরের দুর্গন্ধই যেন হয়ে উঠল বুড়ো-বুড়ির বাঁচার একমাত্র সম্বল।

সখিপুরের মানুষজন সহজ-সরল। বিড়াল মেরে কেউ আনন্দ পাচ্ছে– এটা তাদের কাছে তেমন কোনও খবর নয়। তাই কোনও বাধা না পেয়ে বুড়ো-বুড়ি তাদের পৈশাচিক খেলায় মেতে থাকল। যেখানে মানুষ মারা গেলেও কৌতূহল বোধ করে না মানুষ, সেখানে বিড়াল মরলে কার কী এসে যায়?

তখন শীতকাল। আলো-আঁধারির সাথে মিশেছে কুয়াশা। রাতের বেলায় কুঁড়েঘরটাকে মনে হয় পিশাচের স্থায়ী বাসস্থান। এই শীতকালেই এল এক সার্কাস পার্টি। তখন সখিপুরের মানুষের মনে সামান্য আনন্দের হাওয়া বয়ে গেল।

এখানে প্রধান বাজার একটাই। সেটা জমজমাট হয়ে উঠল। খোলা জায়গায় বসানো হলো বিশাল তাঁবু। তারা কোত্থেকে এল, এটা নিয়ে কেউ চিন্তা করল না। কারণ তাদের গাড়ির দু'পাশে অদ্ভুত সব ছবি আঁকা। মানুষের ছবি, বিড়ালের ছবি, শকুনের ছবি। সার্কাসের মালিক পরেছে আরও অদ্ভুত পোশাক–শরীর কালো আলখাল্লা দিয়ে ঢাকা আর মাথায় টুপি, যার দু'দিক থেকে বের হয়ে আছে হরিণের শিঙ। সার্কাস একসময় জমে উঠল। বাজারেও সার্কাসের লোকজন নানারকম খেলা দেখাচ্ছে।

এই সার্কাসে একটা ছেলে কাজ করে। ছেলেটা এতিম। একটা কালো বিড়ালের বাচ্চা– সেটাই যেন তার সব। বিড়ালছানার কালো লোমশ শরীরে হাত দিয়ে ছেলেটা ভুলে থাকে সব যন্ত্রণা। হোক একটা বিড়ালছানা– তার ভেতর জীবন তো আছে।

এটা দেখে সার্কাসের লোকেরা হাসে। হাসে সখিপুরের ছেলেমেয়েরা। হাসে বড় মানুষগুলোও। তখন ছেলেটা কাঁদে। এ ছাড়া সে আর কী করতে পারে?

তিনদিন পর ছেলেটা তার বিড়ালছানাটাকে খুঁজে পেল না। তখন সে পথে পথে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। বাজারে গিয়ে কাঁদতে লাগল। অবুঝ ছেলেটার বুক-ফাটা কান্না বাতাস ভারী করে তুলল। পাষাণ হৃদয়ের মানুষরা ভাবল ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে। প্রাণপ্রিয় বিড়ালকে হারিয়ে ছেলেটা পাগলের মতই

হয়ে গেছে। তখন আরেক পাগল ছেলেটাকে বলল রহস্যময় কুঁড়েঘরটার কথা আর নিষ্ঠুর বুড়ো-বুড়ির কথা।

সে রাতে আকাশে দেখা গেল ভরা চাঁদ। কুয়াশাও পড়েছে ঘন হয়ে। বাতাসেরও কমতি নেই। সব মিলিয়ে চারদিক কেমন জানি হাহাকার করছে। আলো-আঁধারিতে কুয়াশা পাক খাচ্ছে। বাতাস বইছে শোঁ-শোঁ করে। এ সব ভুলে ছেলেটা চলল কুঁড়েঘরটার দিকে। দূর থেকেই দুর্গন্ধটা নাকে এল– অনেক কষ্টে সে বমি থামাল। আরও কাছে এল সে। পুকুর পারে এসে দেখল এক নারকীয় দৃশ্য। চাঁদের আলোতে পুকুরের পানিতে ভেসে আছে হাজার হাজার বিড়ালের মরা শরীর। পচা পানিতে থকথক করছে পুকুর। ছেলেটা ধারণা করল এর ভেতর আছে তার আদরের বিড়ালছানাও, তবে মৃত। সে আর সহ্য করতে পারল না। কিছুক্ষণ বমি করল। তারপর কোনওরকমে চলে এল তাঁবুতে। আসার সময় তার কানে ভেসে আসছিল হাজার হাজার বিড়ালের গোঙানি। রাতে ছেলেটা ঘুমাতে পারল না।

সকালে ছেলেটা ধ্যানে বসল। তারপর শুরু করল প্রার্থনা। সূর্যের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে অজানা এক ভাষায় শুরু করল প্রার্থনা। প্রার্থনার ভাষা কেউ বুঝতে পারল না। বোঝার চেষ্টাও করল না কেউ। পাগলে তো কত কিছুই করে, এমন একটা ভাব সবার মনে। সবাই ভাবল ছেলেটা কোনও কারণে পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে।

এভাবে সময় পার হতে থাকল। চলছে ছেলেটার প্রার্থনা। এভাবে কয়েক ঘণ্টা পার হলো। সূর্য উঠে এল আকাশে। ছেলেটা ঘামছে। কিন্তু বিড়বিড় করে প্রার্থনা করেই চলেছে। হঠাৎ করে আকাশের চেহারা পাল্টে যেতে লাগল। পরিষ্কার আকাশে কালো

মেঘ জমতে শুরু করেছে। সূর্য হারিয়ে গেল মেঘের আড়ালে। ধীরে ধীরে মেঘগুলো অদ্ভুত আকার ধারণ করতে লাগল। সেগুলো জমতে লাগল ছেলেটার মাথার ওপরের আকাশে। মেঘগুলো এখন স্পষ্টভাবে নানা রকম প্রাণীর আকার নিচ্ছে। কোনও নির্দিষ্ট প্রাণী নয়। কয়েকটা প্রাণী এক করলে যে রকম প্রাণীর সৃষ্টি হয়, সে রকম একটা শিঙওয়ালা প্রাণীর আকার নিল মেঘগুলো।

সারাটা দিন এভাবে চলল মেঘের খেলা আর ছেলেটার প্রার্থনা। ছেলেটার প্রতি কারও মনোযোগ ছিল না। তবে মেঘের খেলা দেখল গ্রামবাসীরা– কেউ মুগ্ধ হয়ে, কেউ ভয় পেয়ে। সূর্য ডোবার পর থামল ছেলেটার প্রার্থনা। সেই সাথে থামল মেঘের কারসাজি।

সেই রাতেই ছেলেটা চলে গেল সার্কাস পার্টির সাথে।

তার পরের দিন সকালে গ্রামবাসী দেখল, পুরো গ্রামে একটিও বিড়াল নেই। হঠাৎ করে এতগুলো বিড়াল কোথায় গেল? চিন্তায় পড়ে গেল তারা। তখন তাদের মনে পড়ল ছেলেটার কথা। মনে পড়ল অদ্ভুত মেঘগুলোর কথা। তা হলে কি ছেলেটা কোনও মন্ত্রবলে সব বিড়াল নিয়ে গেছে? এটা কী করে হয়, ভাবল গ্রামবাসী, পুঁচকে একটা ছেলের এত ক্ষমতা থাকে কীভাবে? আর শয়তান বুড়ো-বুড়ি তো আর এক রাতেই সব বিড়াল মারতে পারে না। এ এমন এক রহস্য যা নিয়ে সবাই মাথা না ঘামিয়ে পারল না। তা হলে কি তাদের গ্রামে শয়তান ভর করেছে? এমন প্রশ্ন উঁকি মারতে শুরু করল গ্রামের মুরুব্বিগোছের মানুষগুলোর মাথায়।

এক লোক জানাল, বুড়ো-বুড়ির কুঁড়েঘরের চারপাশে নাকি বিড়ালগুলো ঘোরাঘুরি করছে। লোকটার কথা কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। তবে এর সত্যতা যাচাই করার জন্য কেউ সাহস

করে কুঁড়েঘরে যাওয়ার প্রস্তাব দিল না। গ্রাম থেকে সব বিড়াল চলে গেলে কার কী এসে যায়? তা ছাড়া রাত হয়েছে অনেক। জোছনার আলো থাকলেও কেউ ভরসা পেল না। যা করার সকালে করা যাবে, এটা ভেবে যে যার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ রাতটা ফিসফাস করে কাটাল। অনেকদিন পর, কথা বলার মত একটা বিষয় পাওয়া গেছে।

সকালবেলায় ঘটল সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাটা। ঘুম থেকে সবাই উঠে দেখে যে, সব বিড়াল ফিরে এসেছে। যার যে রকম বিড়াল ছিল– সব ফিরে এসেছে। যার বিড়াল বুড়ো-বুড়ির ফাঁদে পড়ে মরেছিল, সেগুলোও ফিরে এসেছে! সারা গ্রামে এই আজব খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। পুরো গ্রামটা যেন কেঁপে উঠল এই খবরে। জীবিত বিড়াল ফিরে এসেছে, এটাতে কোনও চমক নেই। কিন্তু মৃত বিড়াল ফিরে এসেছে, এটা তো ভয়াবহ একটা খবর! এই খবরটাতেই গ্রামটা কাঁপল। কিন্তু কয়েকদিনের ভেতর, বিড়ালগুলো যখন একসাথে চলাফেরা শুরু করল– তখন কোনটা মরেছিল আর কোনটা বেঁচে ছিল সেটা আর বোঝার উপায় থাকল না। আর গ্রামে তো কেউ শখ করে বিড়াল পোষে না যে হারিয়ে যাওয়া বিড়ালের নিখুঁত হিসাব রাখবে।

এরপর শুরু হলো আরেক ঝামেলা। গ্রামবাসীরা খেয়াল করল, এক সপ্তাহ ধরে বিড়ালগুলো কোনও খাবার খাচ্ছে না। যাচাই করে দেখা হলো কথাটা সত্যি। তাদের সামনে খাবার রেখে দিলেও তারা খাবার স্পর্শ করছে না। দলে দলে তারা দিনের বেলায় তাকিয়ে থাকে সূর্যের দিকে। আর রাতের বেলায় যেখানে আগুন পায় সেখানে গিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু খাবার খায় না কেউ।

পরেরদিন একজন বলল, রাতের বেলায় বুড়ো-বুড়ির

কুঁড়েঘরে বাতি জ্বলছে না বেশ কয়েকদিন ধরে। গ্রামের চেয়ারম্যান সাহেব দেখল এখন সে যদি কিছু না করে, তা হলে সামনের নির্বাচনে ভোট পাওয়া মুশকিল হবে। তাই সাহস করে সে প্রস্তাব দিল, বুড়ো-বুড়ির কুঁড়েঘরে যাওয়া দরকার। জানা দরকার কেন রাতের বেলায় ওখানে আলো জ্বলে না। সে আরও জানাল, রাতের বেলায় কাজটা না করে, দিনের বেলাতেই করা উচিত। কারণ, যদি কোনও অঘটন ঘটে থাকে, তা হলে সাথে সাথে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

পরদিন সকালে চেয়ারম্যান লোকজন নিয়ে রওনা দিল বুড়ো-বুড়ির কুঁড়েঘরের উদ্দেশে। সবার মনে উত্তেজনা। এতদিন যে জায়গা তারা সবাই এড়িয়ে গেছে, আজ সেখানে গিয়ে কী দেখবে এটা সবাই ভাবছে। তবে ভয়ের কিছু নেই। এখন সকাল। চারদিকে সূর্যালোক। এটা ভেবে সবাই সাহস পেল।

ঝোপ-ঝাড় আর ঘন গাছপালার কাছে আসতেই তারা টের পেল, বাতাসে যে কটু গন্ধটা থাকার কথা, সেটা নেই। পুকুরটার পারে এসে সবাই দেখল পুকুরের পানিতে মরা বিড়াল ভাসছে না। পানি একদম পরিষ্কার। টলটল করছে।

কুঁড়েঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। জায়গাটা অসম্ভব নীরব মনে হলো সবার কাছে। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করা। বুড়ো-বুড়ির অবস্থা জানতে হলে দরজাটা ভাঙতে হবে। সেটা কোনও কঠিন কাজ নয়। পাটকাঠির তৈরি দরজা সহজেই ভাঙা যাবে। কিন্তু কাজটা করবে কে?

আপাতত বিপদ নেই এটা চেয়ারম্যান এখানে এসেই জেনে গেছে। তাই সুযোগটা সে কাজে লাগাতে চাইল। দরজা ভাঙার কাজটা নিজেই করবে। দরজায় লাথি মারল চেয়ারম্যান। সাথে সাথে দরজাটা খুলে ভেতরে ছিটকে পড়ল। চেয়ারম্যান সবাইকে

কাছে আসতে বলল। কুঁড়েঘরের ভেতরটা হালকা অন্ধকার। প্রথমে সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখা গেল না। বাইরের আলো ভেতরে প্রবেশ করায় ভেতরের সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেল।

কিন্তু এ কী দেখছে তারা?

বিছানা খালি। মেঝেতে পড়ে আছে দুইটা কঙ্কাল। একটা বুড়োর, আরেকটা বুড়ির।

দৃশ্যটা দেখামাত্র সবাই প্রায় একসাথে চিৎকার দিয়ে উঠল: 'হায় খোদা! এ কী দেখছি আমরা!'

বুড়ো-বুড়ির এ অবস্থা হলো কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর সবাই আন্দাজ করতে পারলেও মুখ খুলে কিছু বলল না কেউ। কারণ উত্তরটা এতই ভয়াবহ যে, কথাটা কেউ মুখে আনার সাহস পেল না।

কঙ্কাল দু'টিকে মাটি চাপা দেয়া হলো। কুঁড়েঘরটাকে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হলো। আগুন যখন জ্বলছে, তখন সখিপুরের সব বিড়াল এসে হাজির হলো। আগুনের লেলিহান শিখার দিকে ওরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ঘণ্টাখানেক পর, কুঁড়েঘরটা যখন পুড়ে ছাইয়ে পরিণত হলো, তখন বিড়ালগুলো যার যার জায়গায় চলে গেল।

এরপর থেকে বিড়ালগুলো সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক হয়ে গেল। আগের মতই যে যা পেল, আগ্রহ নিয়ে খেতে লাগল।

সখিপুরের চেয়ারম্যান নতুন একটা নিয়ম চালু করল: এ অঞ্চলে মানুষ খুন করা চলবে। তবে বিড়াল মারা যাবে না।

বিড়ালগুলো হঠাৎ করে কেন খাওয়া বন্ধ করেছিল? এ সময়ে ওরা কি না খেয়ে ছিল? এই দুই রহস্য নিয়ে কোনও ঝামেলা হলো না। যার মাথায় সামান্য বুদ্ধি আছে তার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু কথাটা কেউ মুখ খুলে বলল না। তবে

বাকি রহস্যের কোনও মীমাংসা হলো না। ওগুলো রহস্য হয়েই থাকল। এটা একসময় কিংবদন্তী হয়ে যাবে। পরবর্তীতে এর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হবে। হয়তো শেষমেশ এটা একটা লোককাহিনীতে পরিণত হবে।

তবে কিংবদন্তী হোক আর লোক-কাহিনী-ই হোক, সখিপুরে কিন্তু কোনওমতে বিড়াল মারা চলবে না। তাই সখিপুরে যদি কখনও বেড়াতে যান, বিড়ালগুলো আপনি আজও দেখতে পাবেন। মনে হবে, বিড়ালগুলো খুব সাধারণ। ওদের কাহিনী বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না। এরকম আজগুবি কাহিনী কেউ-ই বিশ্বাস করবে না।

তবে আপনাকে সতর্ক করছি: এই সাধারণ বিড়ালগুলোকে কখনও মারার চেষ্টা করবেন না।

সরোয়ার হোসেন

***